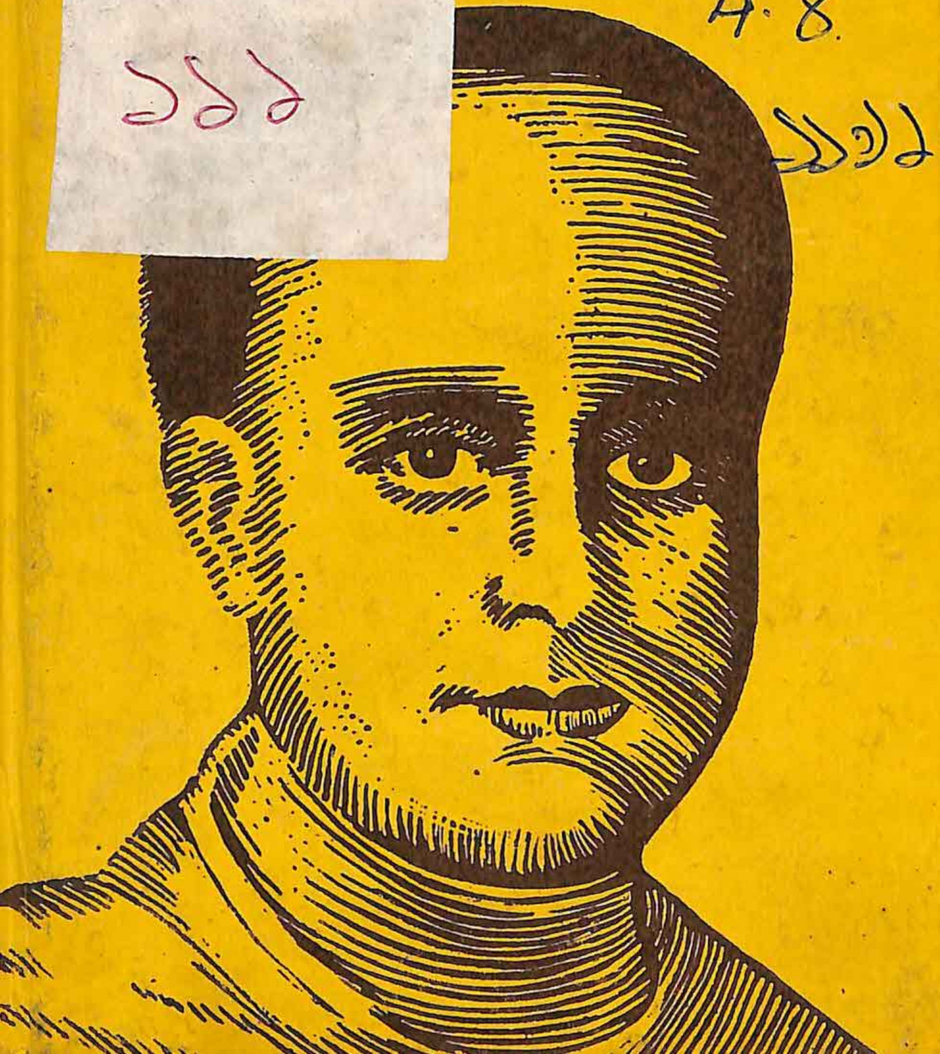
ছোটদের বিদ্যাসাগর

সুনির্মল বসু



ছোটদের বিদ্যাসাগর

সুনির্মল বসু

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—সেপ্টেম্বর, ১৯৮০
—আশ্বিন, ১৩৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ :
—জুলাই, ১৯৮৭
—আষাঢ়, ১৩৯৪

তৃতীয় সংস্করণ :
—ডিসেম্বর, ১৯৮৯
—অগ্রহায়ণ, ১৩৯৬

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
শ্রীগৌতম রায়

মুদ্রাকর :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলিকাতা ৭০০০০৬

মূল্য : সাত টাকা
(Rupees Seven only)

—এক—

"বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নি ?"

"না-মা, আজ এখনও কিছু জোটে নি।"

এই কথা শুনে দয়ালু স্ত্রীলোকটি তাঁকে বসিয়ে মুড়ি-মুড়কি-দই-মিষ্টি দিয়ে প্রচুর ফলার করিয়ে দিলেন। ক্ষুধার্ত-ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে স্ত্রীলোকটিকে কৃতজ্ঞতায় অজস্র ধন্যবাদ জানালেন।

ব্যাপারটা কি হয়েছে জানো।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কলকাতার বড়বাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে ঠন্‌ঠনের দিকে যাচ্ছিলেন একখানি পুরানো পিতলের থালা বিক্রী করতে। এই থালা বিক্রী হলে কিছু পয়সা তিনি পাবেন, তাতেই কিছুদিন চলবে।

পথ চলতে চলতে তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন। হাতে একটিও পয়সা নাই,—কিছু কিনে মুখে দেবেন তারও কোনো উপায় নাই। থালাটিও কেউ কিনতে চাইছে না।

হঠাৎ দেখলেন একজন স্ত্রীলোক দোকানে বসে মুড়কী তৈরী করছে।

এখানে ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকটির কাছে একটু খাবার জল চাইলেন।

স্ত্রীলোকটি ব্রাহ্মণের মুখের দিকে তাকিয়েই যেন বুঝতে পারলেন তিনি বোধহয় অভুক্ত। তাই প্রশ্ন করলেন—"বাবাঠাকুর, আজ বুঝি তোমার খাওয়া হয় নি ?"

ব্রাহ্মণও সত্য কথা বল্লেন—"না-মা, আজ এখনও কিছু জোটে নি।"

এই দুঃস্থ ব্রাহ্মণটি কে জানো ?

ইনি হচ্ছেন দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইস্, কি কষ্টের সংসার ছিল তাঁর কত অভাব-অনটনের মধ্যে তিনি দিন কাটিয়েছেন—ভাবলেও অবাক হয়ে যেতে হয়।

বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর নিজের লেখা অসম্পূর্ণ 'শৈশব চরিত'-এর মধ্যে তাঁর বাবার এই সব দুঃখের কাহিনী লিখে গেছেন। বিধবা স্ত্রীলোকটি যে তাঁর ক্ষুধার্ত বাবাকে আদর করে বসিয়ে ফলার করিয়েছিলেন, তাতে সমস্ত স্ত্রী-জাতির উপর বিদ্যাসাগরের অসীম ভক্তি জন্মেছিল। অজানা, অচেনা, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি গরীবকে বসিয়ে এইভাবে পেট পুরে খাওয়ানো তো আর যার তার কর্ম নয়! স্ত্রীলোক বলেই এ কাজ সম্ভব হয়েছে। দোকানের মালিক পুরুষ হলে ঠাকুরদাসের উপর কখনই এ রকম দয়া প্রকাশ ও বাৎসল্য প্রদর্শন করতেন না।

এ কিন্তু বিদ্যাসাগরের নিজের কথা :—

এইবার এই বিদ্যাসাগরের কথাই আরম্ভ করা যাক্।

ঈশ্বরচন্দ্রের বাবার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আর মা ছিলেন ভগবতী দেবী।

শোনা যায় ঈশ্বরচন্দ্র যখন মায়ের পেটে এসেছিলেন তখন তাঁর মা ভগবতী দেবীর মাথা খারাপ হয়ে যায়। যাকে বলে উন্মাদিনী, তাই হয়ে যান তিনি।

একে অতি দরিদ্রের সংসার, তার উপর স্ত্রী হয়ে পড়লেন পাগল, ঠাকুরদাস দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

ভবানন্দ শিরোমণি নামে এক জ্যোতিষী তখন ভগবতী দেবীর কুষ্ঠি বিচার করে বল্লেন—"ভয় নেই, ভগবতী দেবী সম্পূর্ণ সুস্থ,—কোনো মহাপুরুষ এঁর সন্তানরূপে পেটে এসেছেন, তাঁরই তেজে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। এ অসুখ সাময়িক। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই ইনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

হোলোও ঠিক তাই, ঈশ্বরচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাঁর মা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন।

আর একটি কথাও শোনা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরদাদা রামজয় তর্কভূষণ অতি ধার্মিক লোক ছিলেন। তিনি একবার তীর্থে গিয়ে স্বপ্ন দেখলেন তাঁর বংশে এক বিচিত্র শক্তিশালী অদ্ভুত-কর্মা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন। সে শিশু তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল করবেন, আর দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। এই মহাপুরুষ হবেন দয়ার অবতার।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে রামজয় সাগ্রহে সেই অনাগত মহাপুরুষের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। আসছে, আসছে তাঁদের বংশ-গৌরব, কুলতিলক, মহাতেজা মহাশিশু তাঁর পুত্র-বধূর উদরে।

যথা সময়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হোলো।

আনন্দে অধীর রামজয় পৌত্রের মুখ দেখে বল্লেন,—"এ শিশু সামান্য নয়। উত্তরকালে এ সকলকে পরাজিত করবে। এর প্রতিজ্ঞার পরাক্রমে চারিদিক কেঁপে উঠবে। এর দয়া-দাক্ষিণ্যে

সকলেই মুগ্ধ হবে। আমার স্বপ্নদর্শন আজ সফল হোলো, আমার বংশ আজ পবিত্র হোলো।"

শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সময় পিতা ঠাকুরদাস বাড়িতে ছিলেন না। খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি হাটে গিয়েছিলেন।

রামজয় তর্কভূষণ ছেলেকে এই শুভ খবর দেবার জন্যে ছুটে চল্লেন হাটের দিকে। রাস্তায় দুজনের দেখা।

তর্কভূষণ ঠাকুরদাসকে বল্লেন—"বাড়িতে এক এঁড়ে বাছুর হয়েছে।" ঠাকুরদাস তাড়াতাড়ি বাড়িতে এসে গোয়ালঘরের দিকে চল্লেন 'এঁড়ে বাছুর' দেখতে। কারণ, তাঁদের একটা গরুরও বাচ্চা হবার কথা ছিল।

রামজয় হাসতে হাসতে বল্লেন—"ওদিকে নয়, ওদিকে নয়, আমার সঙ্গে এসো আমি দেখাচ্ছি।"

এই বলে ছেলেকে নিয়ে আঁতুড়-ঘরে ঢুকে নবজাত শিশুকে দেখিয়ে বলেন—"এই দেখ এঁড়ে বাছুর। এ শিশু এঁড়ে বাছুরের মত একগুঁয়ে হবে। যা ধরবে তাই করবে। কারুকে ভয় করবে না। এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও পরম দয়ালু হবে। এর জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্তি লাভ হোলো। এর জন্যে এই বালকের নাম রাখলাম ঈশ্বরচন্দ্র।"

এটা হচ্ছে ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খৃষ্টাব্দের কথা।

—দুই—

গ্রামের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র ভর্তি হলেন আর তিন বছরের মধ্যেই পাঠশালার পাঠ শেষ করলেন। এই সময় তাঁর হাতের লেখাও বড় সুন্দর হয়ে উঠল।

অদ্ভুত প্রতিভাধর বালক। তাঁর সঙ্গে কোনো বিষয়েই তাঁর সমপাঠীরা এঁটে ওঠে না—না বুদ্ধিতে, না বিদ্যায়, না দুষ্টুমিতে।

পাঠশালার গুরুমশাই ঈশ্বরচন্দ্রের বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে বলতেন—"এই দুষ্টু ছেলেটি ভবিষ্যতে একজন বড়লোক হবে।"

এই সময় বালক ঈশ্বরচন্দ্র ভীষণ রকম পেটের অসুখে ভুগতে লাগলেন। অসুখ আর ভালো হয় না। বালক অসুখে ভুগে ভুগে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়লেন, শেষে ছয় মাস চিকিৎসার পর তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বড়ই দুষ্টু ও দুরন্ত ছিলেন। তিনি নিজেই এ বিষয়ে বলেছেন—"ছেলেবেলায় আমি বড়ই দুষ্টু ছিলাম। পাড়ায় লোকের বাগানের ফল পেড়ে চুপে চুপে খেতাম। কেউ রোদে কাপড় শুকোতে দিয়েছে দেখলেই আমার দুষ্টু বুদ্ধি জেগে উঠত।—আমি গিয়ে তার উপর মল-মূত্র ত্যাগ করে আসতাম। লোকে আমার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠত।"

ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমি দেখে কেউ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলত না, কারণ তারা জানত এই দুষ্টু ছেলেটির অনেক গুণ আর অনেক বুদ্ধি।

একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের দুষ্টুমিতে অস্থির হয়ে পাড়ার একটি বউ তাঁকে মন্দ বলেন। তখন বউটির শাশুড়ী তাঁকে বলেন—"ছি ছি,

একে কিছু বোলো না। এর ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, এ ছেলে একজন নামী লোক হবে।"

পাড়ার লোকের ছিল এমনি বিশ্বাস ছেলেটির ওপর।

প্রতিদিন ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র ধানের শিষ তুলে চিবোতেন। একবার একটি শিষ তাঁর গলায় আটকিয়ে যায়।

এবার হোলো মারাত্মক কাণ্ড। গলায় ধানের শিষ আটকে বালক যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রাণ যায় যায়—দম আটকে আসে। তারপর অনেক কষ্টে তাঁর ঠাকুরমা সেই শিষ বের করে বালককে রক্ষা করেন।

পাঠশালার পড়া শেষ হলে গুরুমশাই ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাসকে বল্লেন—"এর পাঠশালার পড়া শেষ হয়েছে। এ বালক বড় বুদ্ধিমান। একে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। সেখানে ভালো করে ইংরাজী পড়াও।"

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুর্দা রামজয় তর্কভূষণের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কার্তিক মাসের শেষের দিকে ঠাকুরদাস তাঁর ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে কলকাতা যাত্রা করলেন। সঙ্গে চললেন তাঁর গুরু কালীকান্ত আর আনন্দরাম গুটি নামে একজন চাকর।

বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে ছাড়তে তাঁর মা ভগবতী দেবী আকুল হয়ে উঠলেন। তাঁদের কলকাতা যাবার সময় তিনি গলা ছেড়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। তাঁর কান্না যেন আর থামতে চায় না।

তখন পায়ে হেঁটে কলকাতা আসতে হোতো। অন্য কোনো উপায় ছিল না।

তাই পিতা, পুত্র, গুরুমশাই আর চাকর—চারজনেই পায়ে হেঁটে কলকাতায় এলেন।

দূরতো আর কম নয়! কাজেই তাঁরা মধ্যে মধ্যে পথে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বিশ্রাম করেছিলেন।

পথের মাঝে মাঝে 'মাইল ষ্টোন্' বা পথের দূরত্ব বোঝবার জন্যে যে সব পাথরের পাটা ছিল তাই দেখে কৌতূহলী ঈশ্বরচন্দ্র বালক জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা বাটনা বাটা শিলের মতো এগুলি কি?"

ঠাকুরদাস বল্লেন—"এগুলি হচ্ছে মাইল ষ্টোন্। এক মাইল অন্তর অন্তর এই রকম এক একটি মাইল ষ্টোন্ মাটিতে পোঁতা আছে। ইংরাজী অক্ষরে মাইলের অঙ্ক লেখা।"

অবাক কাণ্ড!

ঈশ্বরচন্দ্র পথ চলতে চলতে এই 'মাইল ষ্টোন'গুলি দেখে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ইংরাজী অক্ষরগুলি শিখে ফেল্লেন।

কলকাতায় এসে বড়বাজারের বিখ্যাত সিংহ-পরিবারে ঠাকুরদাস আশ্রয় নিলেন। এই পরিবারের সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিশেষ পরিচয় ছিল। বাড়ির কর্তা জগদ্দুর্লভ সিংহ ঠাকুরদাসকে বাবার মতো শ্রদ্ধা-ভক্তি করতেন।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র এই পরিবারে থেকেই লেখা-পড়া করবেন স্থির হোলো। সিংহ-পরিবারও এই প্রতিভাধর বালকটিকে সানন্দেই গ্রহণ করলেন।

নিতান্ত বালক, এখনো শিশু বল্লেই হয়। কিন্তু তা হলে কি হয়। কী অদ্ভুত তাঁর মেধা, কী অপূর্ব তাঁর বুদ্ধি।

ঠাকুরদাস যেদিন সিংহ-পরিবারে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে আসেন,

তার পরদিন তিনি জগদ্দুর্লভ বাবুর কয়েকখানা ইংরাজী বিল ঠিক করে দিচ্ছিলেন। তাই দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বল্লেন—"বাবা, আমি বিলগুলি ঠিক করে দিতে পারি।"

সত্যি সত্যিই ঈশ্বরচন্দ্র কয়েকখানি বিল ঠিক করে দিলেন। একটিও ভুল হয় নাই। এই কাণ্ড দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল।

গুরু কালীকান্ত কাছেই ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরচন্দ্রের মুখে চুমু খেয়ে আনন্দে গদ-গদ হয়ে বলে উঠলেন—"বাবা ঈশ্বর, তুমি চিরজীবী হও। তোমায় যে আমি অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতাম, আজ তা সার্থক হোলো।"

ঠাকুরদাসও বুঝলেন, তাঁর এই দুরন্ত ও দুষ্টু ঈশ্বরচন্দ্র সোজা ছেলে নয়। একে ভালো স্কুলে ভালোভাবে পড়াতে হবে। এই ছেলে তাঁর বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো কারণ নাই।

—তিন—

ঠাকুরদাস ঠিক করলেন ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে পড়াবেন। তাই শুনে সকলে তো অবাক! "আপনি দশ টাকা মাইনে পান, হিন্দুস্কুলে ছেলেকে কি করে পড়াবেন? সেখানের মাইনে যে পাঁচ টাকা।"

ঠাকুরদাস বলেন—"তা হোক্, পাঁচ টাকায় কোনোরকমে সংসার চালাব আর বাকী পাঁচ টাকায় ছেলের স্কুলের মাইনে দেব। তাকে ভালো স্কুলে পড়াতেই হবে।"

ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দুস্কুলে পড়াবেন বলেই স্থির করলেন—কিন্তু তিন মাসের মধ্যে তা আর সম্ভব হোলো না। এই তিন মাস তিনি কাছের একটা পাঠশালায় ছেলেকে পড়ালেন।

জগদ্দুর্লভের সংসারে সবাই বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে ভালোবাসেন, স্নেহ করেন। জগদ্দুর্লভ বাবুর ছোট বোন রাইমণি তাঁকে নিজের ছেলের মতই দেখেন। এই রাইমণি সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিষয়ে রাইমণির সমান স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্তি আমার হৃদয়-মন্দিরে দেবীমূর্তির মত প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। তাঁর অকৃত্রিম গুণের কথা মনে পড়লেই আমার চোখ জলে ভরে যায়।"

জগদ্দুর্লভের সংসারে এসে বালক ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম প্রথম মায়ের আর ঠাকুরমায়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠতেন, তাঁদের কথা ভাবতে তাঁর মন আকুল হয়ে উঠত। ঠাকুরদাস সব সময়ে ছেলের কাছে থাকতে পারতেন না। তাঁকে কাজে বার হতে হোত। তিনি দুপুরে একটার সময় কাজে যেতেন আর রাত একটায় বাড়ি ফিরতেন।

এই সময়ে রাইমণি আর জগদ্দুর্লভ বাবুর পরিবারের অন্যান্য লোক নানা মিষ্টি কথায়, নানারকম ভালো ভালো খাবার-দাবার দিয়ে এই গরীব ঈশ্বরচন্দ্রকে ভোলাতে চেষ্টা করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতায় এসেছিলেন আর ফাল্গুন মাসেই উৎকট অসুখে পড়লেন। অতি মারাত্মক অসুখ। কাছেই ছিলেন বিখ্যাত দুর্গাদাস কবিরাজ। তিনি কিছুদিন চিকিৎসা করলেন, —কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের রোগ বেড়েই চলল।

বীরসিংহ গ্রামে এই খবর গেল।

ঈশ্বরচন্দ্রের ঠাকুরমা আর থাকতে পারলেন না। তিনি আকুল হয়ে ছুটে এলেন কলকাতায়, আর নাতিকে নিয়ে ফিরে এলেন বীরসিংহ গ্রামে।

বীরসিংহ গ্রামে এসে বিনা-চিকিৎসায় সাত আট দিনের মধ্যে ঈশ্বর ভালো হয়ে উঠলেন।

সুস্থ হয়ে পড়াশুনা করবার জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র আবার ফিরলেন কলকাতায়। ঠাকুরদাস আবার তাঁকে হাঁটিয়ে কলকাতায় নিয়ে এলেন।

এবার কিন্তু রোগা ছেলেকে কলকাতায় আনতে ঠাকুরদাসের কিছু বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি প্রথমে ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"কেমন ঈশ্বর, হেঁটে যেতে পারবি তো? না, চাকরের কাঁধে চেপে যাবি?"

ঈশ্বর অম্লানবদনে বলেছিলেন—"না বাবা, আমি হেঁটেই যাব। কারুকে কাঁধে নিয়ে যেতে হবে না।"

ঈশ্বর বাহাদুরি করে একথা বল্লেন বটে, তবে পথ চলতে চলতে তাঁর পা টাটিয়ে ফুলে উঠল। আর চলতে পারেন না। এইবার ঠাকুরদাস বিরক্ত হয়ে উঠলেন—"এত করে বল্লাম চাকরের কাঁধে চেপে চল্, বাহাদুরি করে তা শোনা হোলো না। এখন এইখানেই পড়ে থাক্,—আমি এগিয়ে চল্লাম।"

এই বলে ঠাকুরদাস রাগ করে ছেলেকে ফেলে হন্‌হন্ করে কিছুদূর এগিয়ে গেলেন। একবার ফিরে দেখলেন পায়ের ব্যথায় ঈশ্বরচন্দ্র পথে বসে কাঁদছেন, হাঁটতে পারছেন না।

বাবা আবার এলেন ছেলের কাছে,—আর তাঁকে কাঁধে করে আবার পথ চলতে লাগলেন।—"এত ক'রে বল্লাম চাকরের কাঁধে চেপে চল্, এখন চল্ বাপের কাঁধে চড়ে।"

নিরুপায় ঈশ্বরচন্দ্র এইভাবেই কলকাতায় এলেন, পথে কয়েক জায়গায় ঠাকুরদাস বিশ্রাম করেছিলেন।

এইবার স্কুলে ভর্তি হবার কথা।

ঠাকুরদাস স্থির করলেন, ঈশ্বরকে ভালো করে সংস্কৃত শেখাতে হবে। ঈশ্বর ভালো সংস্কৃত শিখতে পারলে ঠাকুরদাস দেশে তাঁকে টোল করে দেবেন।

ঠাকুরদাসের এক আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতি এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে পড়তেন।

তিনি ঠাকুরদাসকে পরামর্শ দেন—"আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়তে দিন। তাতে সব রকমেই তার ভালো হবে।"

এই পরামর্শে ঠাকুরদাস সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত গঙ্গাধর তর্কবাগীশের সঙ্গে আলোচনা করে ঈশ্বরচন্দ্রকে সংস্কৃত কলেজে দেওয়াই স্থির করলেন।

—চার—

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন সোমবার ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন।

যে সময়কার কথা বলছি তখন সংস্কৃত কলেজে কেবল সংস্কৃতই পড়ানো হোত। ইংরাজী শেখার সামান্যই ব্যবস্থা ছিল। সংস্কৃতের

ছাত্রেরা ইচ্ছা না করলে ইংরাজী ভাষা না-ও শিখতে পারতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ভর্তি হলে পিতা ঠাকুরদাস প্রতিদিন সকাল ৯টায় পুত্রকে কলেজে দিয়ে আসতেন আর বিকাল ৪টায় তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন। ছয়মাস ধরে ঠাকুরদাস রোজই এই কাজ করতেন,—তারপর ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই কলেজে আসতেন, বাবাকে আর সঙ্গে আসতে হোত না। ছয়মাস পর ঈশ্বরচন্দ্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পান।

বালক ঈশ্বরচন্দ্রের চেহারাটি ছিল বড় মজার। একে তো দেহটি ছিল বেজায় বেঁটে, তার উপর মাথাটি ছিল বেশ বড়। যখন তিনি ছাতা মাথায় দিয়ে যেতেন, লোকে দেখত কেবল একটি ছাতাই পথ দিয়ে যাচ্ছে।

ছোট শরীরের অনুপাতে মাথাটি বড় ছিল বলে তাঁর সহপাঠিরা তাঁকে 'যশুরে কৈ' বলে ঠাট্টা করত। যশোরের কৈ মাছের মাথা বড় হয় বলে ঈশ্বরচন্দ্র এই নাম পেয়েছিলেন।

এই ঠাট্টায় ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হতেন। রেগে-মেগে কোনো কথা বলতে গেলে—সহপাঠীরা আরো হেসে উঠত—কারণ ঈশ্বর ছিলেন বেজায় 'তোত্‌লা'। রাগ করলে তোতলামি আরো বেড়ে যেত। তিনি সোজা ভাবে কথা বলতে পারতেন না, কোনো শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারতেন না।

এই 'যশুরে কৈ' কথাটি ক্রমে ক্রমে তার সহপাঠীদের মুখে 'কশুরে যৈ' হয়ে উঠল। ঈশ্বরকে নিয়ে তাদের আর বিদ্রূপের শেষ নাই।

এই মাথা-মোটা বেঁটে ছেলেটি যে একজন ভুবন-বিখ্যাত পণ্ডিত

হয়ে উঠবেন, তা কি তারা তখন জানত? তাঁর মাথার থেকে হৃদয়টা যে আরো কত বড়, তা কি তারা তখন বুঝতে পেরেছিল? এই তোত্‌লা ছেলেটি যে একদিন 'বিদ্যাসাগর' হয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে পূজা পাবেন, তা কি তারা তখন ভাবতে পেরেছিল?

ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে যা পড়তেন বাড়িতে বাবার কাছে তাই আবৃত্তি করতেন। ঠাকুরদাসও ভালো সংস্কৃত জানতেন, পুত্রের মুখে রোজ আবৃত্তি শুনে তাঁরও আনন্দ বেড়ে যেত। পুত্র কোনো কথা ভুল করলে ঠাকুরদাস তাঁর সংশোধন করে দিতেন।

ঠাকুরদাসকে বাইরের অনেক কাজ করতে হোত, তবুও ছেলের পড়ার দিকে তাঁর ছিল প্রখর দৃষ্টি। তাঁর কোনো ত্রুটি ঠাকুরদাস সহ্য করতে পারতেন না।

রাত ন'টার পর বাড়ি ফিরে তিনি রান্না-বান্না সেরে ছেলেকে খাওয়াতেন আর নিজেও খেয়ে নিতেন, তারপর ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে এক-সঙ্গেই শয়ন করতেন।

শেষ রাত্রে ছেলেকে তুলে দিতেন পড়া-শোনা করবার জন্যে।

ঠাকুরদাস ছিলেন বড়ই কড়া-প্রকৃতির লোক আর শাসন করতে ভালোবাসতেন। ঈশ্বরচন্দ্র পড়তে পড়তে যদি দৈবাৎ ঘুমিয়ে পড়তেন, তাঁর আর রক্ষা ছিল না—বাবার কাছে দারুণ মার খেতেন।

একদিন ঈশ্বর বাবার কাছে চ্যালাকাঠের এমন মার খেলেন—যে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেলেন কলেজের কেরাণী রামধন গাঙ্গুলীর বাড়িতে। গাঙ্গুলী মশাই তাঁকে আবার বাবার কাছে দিয়ে যান।

সময়ে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাবার হাতে মার খেয়ে এমন চীৎকার করতেন যে সিংহ-পরিবারের সবাই বিরক্ত হয়ে উঠতেন। ঠাকুরদাসকে

তাঁরা বলতেন—"ছেলেকে যদি এরকম প্রহার কর, তবে আমাদের বাড়ি ছেড়ে তোমায় অন্য জায়গায় যেতে হবে। আমরা এরূপ কঠিন শাস্তি পছন্দ করি না। কোন্‌দিন প্রহারের চোটে ছেলেটা মারা যাবে।"

এরকম সাবধান করে দেওয়াতে ঠাকুরদাস কিছুটা সংযত হন।

ঈশ্বরচন্দ্রও খুব সামলে চলতেন। ঘুম আসলে চোখে সরষের তেল দিতেন। তেলের জ্বালায় ঘুম পালাত।

ব্যাকরণ শ্রেণীতে বালক ঈশ্বরচন্দ্র অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন। তাই তিনি অধ্যাপকের অতি প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

এই শ্রেণীতে তিনি তিন বছরের মধ্যে দু বছর অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন, শুধু এক বছর পান নাই।

এই দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজ ছাড়বেন ঠিক করলেন, কিন্তু ঠাকুরদাস ও কলেজের অধ্যাপকেরা অনুমতি দেন নাই।

এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের স্বভাবে আর একটি বিশেষত্ব দেখা গেল। তাঁর চরিত্রে 'একগুঁয়েমি' ভাব ফুটতে আরম্ভ করল। ভীষণ একগুঁয়ে হয়ে উঠলেন তিনি।

বাবা যদি বলেন,—"ফরসা কাপড় পরে কলেজে যাও," ঈশ্বরচন্দ্র বলেন—"না, আমি ময়লা কাপড় পরেই যাব।"

এইজন্যে তাঁর বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হতেন।

ছেলে স্নান করেন না। বাবা বলেন—"আজ ভালো করে স্নান কর।" ঈশ্বরচন্দ্র কিছুতেই স্নান করবেন না। বাবা জোর করে ধরে নিয়ে যান গঙ্গার ঘাটে আর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে স্নান করান।

—পাঁচ—

বাস্‌রে, কী গোঁয়ার-গোবিন্দ ছেলে।

একবার যা গোঁ ধরেন, কার সাধ্য তাঁকে তা থেকে নিরস্ত করে। তবে এটা ঠিক, ঈশ্বরচন্দ্র গুরুজনদের কথার কোনো প্রতিবাদ করতেন না—শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই জন্যে তাঁর বাবা ঠাকুরদাস ঈশ্বরকে 'ঘাড় কেঁদো' বলে ডাকতেন।

ব্যাকরণ পড়ার সময় ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজের ইংরাজী শ্রেণীতে প্রবেশ করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজে এই শ্রেণীটি নতুন হয়েছিল। উলষ্টন সাহেব ছিলেন এই শ্রেণীর অধ্যাপক।

অধিকাংশ ছাত্রই এই শ্রেণীটি পছন্দ করত না। কাজেই অতি অল্প সংখ্যক ছাত্রই এই শ্রেণীতে ঢুকেছিল। ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র ছয় মাস এই ইংরাজী শ্রেণীতে পড়েছিলেন,—তাই ইংরাজীতে তিনি বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা লাভ করেন নাই।

ব্যাকরণ-শ্রেণীতে ঈশ্বরচন্দ্র সাড়ে তিন বছর পড়েন। এই সময় তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন, প্রায় সারারাত জেগে পড়া করতেন। রাত দশটায় খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠাকুরদাস দুই ঘণ্টা জেগে থাকতেন —ঈশ্বরচন্দ্র সে সময়ে ঘুমাতেন। রাত বারোটায় ঠাকুরদাস তাঁকে জাগিয়ে দিতেন, তারপর বালক সারারাত জেগে পড়তেন।

এই রকম পরিশ্রম করতেন বলে ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে কঠিন অসুখে ভুগতেন।

১১ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের পৈতা হয়। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে,

কিন্তু সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ভুলে যান। শুধু বাবার ভয়ে কোনো রকমে কাজ সারেন।

ব্যাকরণ-শ্রেণী শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্র বারো বছর বয়সে কাব্যশ্রেণীতে প্রবেশ করেন। সেই সময় সুবিখ্যাত পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ঐ শ্রেণীর অধ্যাপক ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ মশাই ঈশ্বরচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন।

অন্যান্য সহপাঠীর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বয়সে ছিলেন অনেক ছোট—কিন্তু গুণে ও প্রতিভায় তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। সব বিষয়েই তিনি প্রথম হতেন। পরীক্ষায় তাঁর উত্তরপত্র দেখে অধ্যাপকেরা অবাক হয়ে যেতেন।

রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, মেঘদূত, কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্য তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। অনুবাদও করতে পারতেন ভালো। বই না দেখেও তিনি সংস্কৃত নাটক অনর্গল বলতে পারতেন। বারো বছরের ছেলে অনায়াসে অবিরাম সংস্কৃত কথা বলতে পারতেন।

সে সময়ের পণ্ডিতেরা বালক ঈশ্বরচন্দ্রের এই অদ্ভুত স্মরণশক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতেন। কেউ কেউ বলতেন—"এই বালক একদিন পৃথিবীতে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হবেন।"

শুধু তাই নয় ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখাও ছিল অত্যন্ত সুন্দর। যে দেখত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। তিনি অনেক সংস্কৃত পুঁথি নিজের হাতে নকল করতেন। সেই লেখারও কত প্রশংসা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের হাতের লেখা দেখে মনে হোত যেন কার্পেটের উপর উল বুনে লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় বছরে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্য পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার

করেন। তাঁর সঙ্গে কোনো ছাত্রই পেরে উঠতেন না।

এইবার ঈশ্বরচন্দ্রের মেজভাই দীনবন্ধু কলকাতায় লেখা-পড়া শিখতে এলেন। রান্নার ভার পড়লো ঈশ্বরচন্দ্রের উপর।

নিজের পড়াশুনা ছাড়াও তাঁর উপর অনেকগুলি কর্তব্যের ভার পড়লো।

সকালে স্নান সেরে বাজারে যেতেন এবং সেখানে বাবার অবস্থা অনুযায়ী কিছু তরি-তরকারী কিনে বাড়ি ফিরতেন। তারপর শিল-নোড়া দিয়ে বাট্না বেটে, কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করে উনুন ধরাতেন। সে সময়ে পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই বলে তাঁকে কাঠ চেলা করতে হোত।

বাড়িতে তখন চারজন লোক খেতেন। সকলের জন্যে রান্না সেরে তাদের খাইয়ে—তাদের এঁটো বাসন ধুতেন।

হলুদ বেটে, কাঠ চিরে, বাসন মেজে তাঁর আঙুলের নোখ ক্ষয়ে গিয়েছিল। এতে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কোনো দুঃখ ছিল না। তিনি পরম আনন্দ লাভ করতেন।

ইস্, কত কষ্ট করে বালক ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের পড়া করতে হোত। কিন্তু সর্বদাই তাঁর মুখে হাসি।

যে ঘরে তিনি রান্না করতেন সে ঘরটি ছিল অত্যন্ত নোংরা আর দুর্গন্ধে ভরা। ঘরময় আরস্তুলা ও অন্যান্য পোকা ঘুরে বেড়াত। অনেক দিন ভাত খাবার সময় আরস্তুলা পাতে উড়ে পড়ত।

একদিন ঈশ্বরচন্দ্র না জেনে তরকারীর সঙ্গে একটা আরস্তুলা রেঁধে ফেলেছিলেন। পাছে কেউ টের পান আর ঘৃণায় খাওয়া ত্যাগ করেন এই ভয়ে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই তরকারীর সঙ্গে আরস্তুলাটি খেয়ে ফেলেন।

এইতো খাবার অবস্থা। শোবার ব্যবস্থাও অতি শোচনীয়। অনেক রাত্রে পড়াশোনা সেরে তিনি কোনো রকমে রাত কাটাতেন—দেড় হাত চওড়া ও তুই হাত লম্বা একটা বারান্দায়।

—ছয়—

বাড়িতে তুর্দান্ত পরিশ্রম করেও ঈশ্বরচন্দ্রের পড়া শিখতে কোনো ক্রুটি হোত না। অনেক সময় তিনি কলেজে যাবার সময় বই পড়তে পড়তে যেতেন এবং ঐ ভাবেই কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেন।

বাবুগিরি তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। চিরদিন মোটা কাপড় আর মোটা চাদর ব্যবহার করতেন।

তাঁর মা দেশে চরকায় সূতো কেটে কাপড় তৈরী করে ঈশ্বরকে পাঠাতেন। সেই মোটা সূতোর কাপড় প'রে ঈশ্বর কলেজে যেতেন।

আগেই বলেছি ঈশ্বরচন্দ্রের বাবা ঠাকুরদাস ভয়ানক কড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। ঈশ্বরের কোনো ক্রুটি দেখলে তিনি তাঁকে ভীষণ শাসন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রও বাবাকে অত্যন্ত ভয় করতেন।

কাব্যে আর ব্যাকরণে ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ দক্ষতা জন্মেছিল। বীরসিংহ গ্রামে অনেকের শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে অতি অল্প বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কবিতা রচনা করে দিতেন। সেই সব কবিতা দেখে তখনকার বড় বড় পণ্ডিতেরা অবাক হয়ে যেতেন। কী সুন্দর সে সব রচনা।

সেই বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র শ্রাদ্ধ-সভায় উপস্থিত পণ্ডিতদের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের বিচার করতেন। তাঁর এইসব জ্ঞানগর্ভ বিচার-পদ্ধতির কথা চারিদিকে রটে গেল। সবাই 'ধন্য ধন্য করতে

লাগলো। লোকে বলতে লাগলো—'ঈশ্বরচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত।'

ঈশ্বরচন্দ্রের খ্যাতি চারিধারে রটে গেল—কাজেই অনেক গ্রাম থেকে তাঁর বিয়ের সম্বন্ধ আসতে লাগলো। এমন পণ্ডিত জামাই কে না চায়?

শেষে ক্ষীরপাই গ্রামবাসী শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যের সাত বছরের মেয়ে দীনময়ীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেলো।

এ বয়সে বিয়ে করতে ঈশ্বরচন্দ্রের মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তাঁর বাবার অনুরোধে তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হলেন।

দীনময়ী ছিলেন অত্যন্ত সুলক্ষণা ও অতিশয় ভাগ্যবতী কন্যা। তাঁর অনেক গুণও ছিল, স্বভাবও ছিল অতি সুন্দর। তাই ঠাকুরদাস তাঁর ছেলের জন্যে এই মেয়েটিকে পছন্দ করেন।

দীনময়ীর বাবা শত্রুঘ্ন ভট্টাচার্যও ছিলেন অতি তেজস্বী বলশালী ব্রাহ্মণ। এইরূপ বলবান লোক তখন তাঁর গ্রামে আর কেউ ছিল না। কিন্তু তাঁর হৃদয় ছিল অতি উদার ও কোমল। এই স্বভাবের জন্য তিনি গ্রামে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। তাঁর গায়ের জোর সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তাঁর প্রতাপে সেই সময়ে অনেক দস্যু-লেঠেল্ জব্দ হয়েছিল।

দীনময়ী ছিলেন এই বলশালী শত্রুঘ্নের মেয়ে।

মাত্র পনেরো বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র অলঙ্কার-শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। অলঙ্কারশাস্ত্র বড়ই কঠিন। এই শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন বয়সে তিনি সকলের ছোট।

এক বছরের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ, রসগঙ্গাধর

প্রভৃতি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়ে ফেলেন। বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম হয়ে সকলের থেকে বেশী পুরস্কার পান। এই পুরস্কারে তিনি বই আর টাকা দুই-ই পেয়েছিলেন।

একদিন বালক ঈশ্বরচন্দ্রের মুখে সাহিত্যদর্পণের সুন্দর আবৃত্তি শুনে তখনকার বিখ্যাত দার্শনিক জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন বলেছিলেন—"এত ছোট ছেলের মুখে সাহিত্যদর্পণের এমন সুন্দর আবৃত্তি আমি শুনি নি। এই বালক বড় হলে বাংলাদেশে একজন অদ্বিতীয় লোক হবে।"

এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র কলেজে ৮ টাকা বৃত্তি পেতেন। বৃত্তি যা পেতেন তিনি তা তাঁর বাবার হাতে এনে দিতেন। ঠাকুরদাস ছেলের বৃত্তির টাকায় বীরসিংহ গ্রামের কাছে 'টোল' বসাবার জন্যে কিছু জমি কিনেছিলেন।

ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্রের মনটা ছিল বড়ই নরম। পরের দুঃখে তিনি কাতর হয়ে উঠতেন। প্রাণপণে তিনি পরের উপকার করতে চেষ্টা করতেন।

জলখাবার খাওয়ার সময় কাছে কোনো ছেলে উপস্থিত থাকলে তিনি তাদেরও ভাগ দিতেন। কারো ছেঁড়া কাপড় দেখলে, নিজের কাছে পয়সা না থাকলেও কারো কাছ থেকে ধার করে তাকে কাপড় কিনে দিতেন। বাসায় কেউ আসলে তৎক্ষণাৎ তাকে জলখাবার খেতে দিতেন। কারো কোনো অসুখ হয়েছে শুনলে তৎক্ষণাৎ ছুটে যেতেন আর তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কারো কোনো ছোঁয়াচে রোগ হলে তিনি অম্লানবদনে তার কাছে গিয়ে হাসিমুখে তার মলমূত্র পরিষ্কার করতেন।

কলকাতা থেকে যখন দেশে আসতেন, অমনি সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন,—গুরুজনদের প্রণাম করে আসতেন। কারো অসুখের খবর পেলে তার সেবার ভার নিতেন।

এইজন্যে তাঁর দেশবাসীরা ঈশ্বরচন্দ্রের নাম রেখেছিল 'দয়াময়'। তখনো তিনি 'বিদ্যাসাগর' হন নাই, তবে দয়ারসাগর হয়েছিলেন। কুকুর বিড়ালটি মরলেও তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরতো।

ছেলেবেলায় ঈশ্বরচন্দ্রের মস্ত সখ ছিল কবির গান শোনা। তিনি তাঁর সাথীদের দিয়ে কবির গান করতেন।

কপাটি খেলা ও লাঠি খেলাও ঈশ্বরচন্দ্র খুব ভালোবাসতেন। কখনো কখনো তিনি সাথীদের সঙ্গে জুটে মাঠের থেকে ধান কেটে আনতেন।

—সাত—

নিজের হাড়ভাঙা খাটুনির কথা অসঙ্কোচে বন্ধুদের কাছে বলতে ঈশ্বরচন্দ্র লজ্জা পেতেন না, বরং তারা প্রশংসাই করতো।

তিনি যখন অলঙ্কার শ্রেণীতে পড়তেন, তখন তাঁর দুই-বেলা রান্না করতে হোত। এই গুরুতর পরিশ্রমে তাঁর ভীষণ পেটের অসুখ হয়ে গেল।

ঈশ্বরচন্দ্রের মেজভাই দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে এই সময়ে কাজে কিছু কিছু সাহায্য করতেন, আর মধ্যে মধ্যে বাজার করে দিতেন। একদিন দীনবন্ধু সন্ধ্যার সময় বাজার করতে গিয়ে জোড়া-সাঁকোর এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাইকে অনেক রাত পর্যন্ত ফিরতে না দেখে চারিধারে খোঁজাখুঁজি করে নতুন বাজারের এক বারান্দার উপর তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বাজারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

সেই থেকে ঈশ্বরচন্দ্র দীনবন্ধুকে আর একা বাজারে যেতে দিতেন না।

অলঙ্কার শ্রেণীর পড়া শেষ করে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র স্মৃতি-শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখনকার দিনে এই স্মৃতি-শ্রেণীতে ভর্তি হবার আগে ন্যায়দর্শন ও তারপরে বেদান্ত পড়তে হোত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুগ্রহে তিনি অলঙ্কার শ্রেণী থেকেই স্মৃতির শ্রেণীতে ভর্তি হবার আদেশ পান।

তখন ঈশ্বরচন্দ্রের ১৭।১৮ বছর মাত্র বয়স। এই বয়সেই কী অদ্ভুত শক্তি, কী অসাধারণ প্রতিভা! ভাবলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়!

পণ্ডিতেরা পর্যন্ত দুই তিন বছরের মধ্যে স্মৃতি-শাস্ত্র পড়ে উঠতে পারতেন না,—কিন্তু বালক ঈশ্বরচন্দ্র মাত্র ছয় মাসের মধ্যে এই পড়া শেষ করেন।

এই ছয় মাস সময় তিনি রান্না-বান্না করতেন না, মাত্র ২।১ ঘণ্টা ঘুমাতেন। সমস্ত স্মৃতি তিনি মুখস্থ করে ফেলেছিলেন।

তাঁর অধ্যাপকেরা ও সহপাঠীরা তাঁর এই অলৌকিক শক্তি দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

স্মৃতিতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি 'ল কমিটির' পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হন, সে সময় ত্রিপুরা জেলায় জজ-পণ্ডিতের পদ খালি হয়। তিনি এই পদের জন্যে চেষ্টা করলেন এবং পেয়েও গেলেন।

কাজতো পেলেন, কিন্তু ঈশ্বরের বাবা ঠাকুরদাস তাঁকে ত্রিপুরা যেতে বারণ করলেন।

পিতৃভক্ত পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র পিতার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না; তিনি জজ-পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করলেন না,—বেদান্ত শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

সেই সময়ে শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতি মশাই বেদান্তের অধ্যাপক ছিলেন। বেদান্ত পড়বার সময় ঈশ্বরচন্দ্র গদ্য রচনায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ১০০ টাকা পুরস্কার পান।

বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই বলেছেন—"বাল্যকালে আমি অনেক কষ্ট পাইয়াছি, কিন্তু কোনো কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া ভাবি নাই, বরং তাহাতে আমার উৎসাহ-উদ্যম বর্ধিত হইত। কিন্তু ভাইগুলির কষ্ট দেখিয়া আমার অত্যন্ত অন্তর্যাতনা হইত।"

বিকালের জলখাবারের জন্যে আধপয়সার ছোলা এনে ভেজানো হোত আর আধপয়সার বাতাসা আসত। ঐ ভেজা ছোলার অর্ধেকটা আবার রাত্রে তরকারীতে ব্যবহার করা হোত।

ঈশ্বরচন্দ্র নিজেই রান্না করতেন দুইবেলা। ভাইদের পাতে তরকারী দেবার সময় তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।

ঈশ্বরচন্দ্রের দুটি ভাই তখন কলকাতায় তাঁর সঙ্গে থাকতেন। ঠাকুরদাস তখন ঋণগ্রস্ত, তাঁহার আশ্রয়-দাতা সিংহ-পরিবারও ঋণে জর্জরিত।

এক জঘন্য ঘরে ঠাকুরদাস ছেলেদের নিয়ে রাত্রে শুতেন। কী যে কষ্ট হোত তা আর কি বলব!

ঈশ্বরচন্দ্র তবুও দমতেন না। তিনি এই সময়ে ন্যায়-দর্শন

শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। লেখা পড়া শিখবার কী অদম্য স্পৃহা।

এই শ্রেণীতেও ঈশ্বরচন্দ্র সর্বপ্রথম হয়ে ১০০ টাকা ও কবিতা রচনায় ১০০ টাকা পুরস্কার পান।

কি অদ্ভুত শক্তি তাঁর! পাঁচ বছরে তিনি দর্শন-শাস্ত্রের পড়া শেষ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলেজের পড়া শেষ করলে উপাধি পেলেন 'বিদ্যাসাগর'।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন কুড়ি বছরের যুবক। ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি বিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারলে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র সবাইকে তাক্ লাগিয়ে এই দুর্লভ উপাধি পেলেন। তাঁর অধ্যাপকেরাও ছাত্র-গর্বে গর্বিত হলেন আর ঈশ্বরচন্দ্রকে ধন্য ধন্য করতে লাগলেন।

—আট—

কলেজের পড়া শেষ করে বিদ্যাসাগর চাকরিতে প্রবেশ করলেন।

এই সময়ে ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয়। প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হওয়ায় অনেকেই সে পদের জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরের গুণ ও প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিদ্যাসাগরকেই এই পদটি দিলেন।

এই পদের মাইনে ছিল পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু মর্যাদা ছিল অনেক।

আগে মধুসূদন তর্কালঙ্কার এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিদ্যাসাগর এই পদটি পান।

ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে সিবিলিয়ান সাহেবদের মাসে মাসে পরীক্ষা দিতে হোত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা নির্দিষ্ট সময় ছিল। তার মধ্যে উত্তীর্ণ হতে না পারলে সাহেবদের আবার দেশে ফিরে যেতে হোত।

বিদ্যাসাগর মশাই মাসে মাসে তাদের পরীক্ষার কাগজ দেখতেন। এ ছাড়াও, মার্শাল সাহেব তাঁর কাছে সংস্কৃত কাব্যাদি পড়তেন।

বিদ্যাসাগরকে এই সময়ে হিন্দীও শিখতে হয়েছিল, কারণ হিন্দী পরীক্ষার কাগজ-পত্রও তাঁকে দেখতে হতো।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের কাছে অনেকে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও কাব্যাদি পড়তে আসতেন। তাঁদের পড়িয়ে তিনি আবার নিজে ইংরাজী পড়তেন। অঙ্ক শিখবার জন্যেও তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেন। সব বিষয়েই পণ্ডিত হবেন,—এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করে সত্যিকারের বিদ্যাসাগর হতে চান তিনি।

কিন্তু অঙ্ক-শাস্ত্রটা শেষ পর্যন্ত তাঁর ভালো না লাগায় ছেড়ে দিলেন। তারপর তিনি 'সেক্সপীয়র' পড়বার জন্যে প্রায়ই শোভাবাজার রাজবাটীতে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। সেখানে আনন্দকৃষ্ণ বসু নামে একজন ভদ্রলোক বিদ্যাসাগরকে ইংরাজী 'সেক্সপীয়র' পড়াতেন।

একদিন হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে দেখে শোভাবাজার রাজবাটীর রাজা-বাহাদুর মুগ্ধ হন। তিনি এরকম জ্যোতির্ময় চেহারা পূর্বে আর দেখেন নাই। তিনি বিদ্যাসাগরকে ডেকে আলাপ করেন।

এই রাজবাটীতে অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় হয়। তখন অক্ষয়বাবু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার সঙ্গে বিদ্যাসাগরও জড়িয়ে পড়লেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় বিদ্যাসাগরের মহাভারতের বাংলা অনুবাদ ক্রমশ প্রকাশিত হয়। এর কিছুদিন পর কালিপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সম্মতি নিয়ে মহাভারতের অনুবাদ আরম্ভ করেন।

মহাভারত অনুবাদ করার আগে বিদ্যাসাগর 'বাসুদেব চরিত' আর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে দুইটি বই লেখেন।

কিছুদিন পরই বিদ্যাসাগর মশাই 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বাড়ির কাছেই থাকতেন রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হিন্দু কলেজে কিছু ইংরাজী শিখে অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছেড়ে দেন। তিনি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত পরিচিত এবং প্রায় রোজই তাঁর বাড়িতে যেতেন।

একদিন বিদ্যাসাগরের বাড়ি গিয়ে তিনি দেখলেন বিদ্যাসাগরের মেজভাই দীনবন্ধু মেঘদূত 'সুর করে' পড়ছেন। এই পড়া শুনে রাজকৃষ্ণবাবু মুগ্ধ হলেন,—তাঁর সংস্কৃত শিখতে বড়ই ইচ্ছা হোলো।

বিদ্যাসাগরকে এই ইচ্ছা জানাতেই তিনি রাজকৃষ্ণবাবুকে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে রাজি হলেন।

কিন্তু সহজে তো সংস্কৃত শেখানো যায় না। তাই বিদ্যাসাগর একটা সহজ উপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

এই সহজ উপায় চিন্তা করতে করতে তাঁর হাত দিয়ে বের

হোলো 'উপক্রমণিকা'।

একদিন রাজকৃষ্ণবাবু দেখলেন, চার পাতা ফুলস্কেপ কাগজে বাংলা অক্ষরে বর্ণমালা থেকে ধাতু-প্রত্যয় পর্যন্ত মুগ্ধবোধের সারাংশ বিদ্যাসাগর মশাই লিখে রেখেছেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের শেখাবার গুণে রাজকৃষ্ণ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষা শিখে ফেল্লেন। পরে তিনি কাব্য ইত্যাদি পড়তে আরম্ভ করেন।

এই রাজকৃষ্ণবাবু শেষে সংস্কৃত কলেজের সিনিয়ার পরীক্ষায় ১৫ টাকা বৃত্তি পান।

এ বড় কম কথা নয়। যিনি সংস্কৃতের কিছুই জানতেন না, অতি অল্প দিনের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁকে নিজের সহজ শিক্ষার গুণে সংস্কৃতে পণ্ডিত করে তুল্লেন।

—নয়—

ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাজ করবার সময়েই ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তখনকার বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাংলা ভাষা শেখবার জন্যে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ের আদর্শে বাংলা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। চার বছরের মধ্যেই এইরকম চারশোটি বিদ্যালয় তৈরী হয়।

এই সমস্ত স্কুলের সঙ্গেও বিদ্যাসাগরের সম্বন্ধ ছিল। এই সব স্কুলে বাংলা ভাষার প্রসার হয়। বিদ্যাসাগর মশাই এর জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা ও পরিশ্রম করেছিলেন।

এই সময় একদিন তাঁর বাবা ঠাকুরদাস কাজের জায়গায় যেতে

এক দুর্ঘটনায় পড়ে আহত হন।

এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে কাজ ছাড়তে পরামর্শ দেন আর বলেন—"বাবা, আমি তো এখন মাসে ৫০ টাকা মাইনে পাচ্ছি। আপনি আর পরিশ্রম করছেন কেন। আপনি এখন দেশে গিয়ে বিশ্রাম করুন। এই টাকাতেই স্বচ্ছন্দে সংসার চলে যাবে।"

ছেলের পরামর্শে ঠাকুরদাস চাকরি ছেড়ে দেশে চলে যান।

বিদ্যাসাগর মশাই মাসে মাসে বাড়িতে ২০ টাকা করে পাঠাতেন। এই সময় ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর দুই ভাই, দুই খুড়তুতো ভাই, দুই পিসতুতো ভাই, এক মাসতুতো ভাই আর বাড়ির চাকর শ্রীরাম নাপিত —এই কয়জনে থাকত। এ ছাড়াও মধ্যে মধ্যে ২।৪ জন বেশী লোকও দু'বেলা খাওয়া-দাওয়া করত।

তাই বিদ্যাসাগর নিজের বাড়ির খরচের জন্যে ৩০ টাকা রাখতেন। বাড়ির সবাইকেই রান্না করতে হোত। বিদ্যাসাগর মশাইও রান্না করতেন।

এই সময়ে মার্শাল সাহেব সংস্কৃত কলেজের 'জুনিয়ার' ও সিনিয়ার' পরীক্ষার পরীক্ষক হন। এ বিষয়ে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে সাহায্য করতেন।

ব্যাকরণ, কাব্য, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি সব প্রশ্নই বিদ্যাসাগর মশাই নিজেই লিখে দিতেন।

বিদ্যাসাগর ৫০ টাকা মাইনে পান। ২০ টাকা দেশে পাঠান, আর ৩০ টাকা নিজেদের এতগুলি লোকের জন্য রাখেন। কলকাতার সমস্ত খরচ চালিয়েও এই টাকায় দুঃস্থদের অন্ন-বস্ত্র যোগান আর অসুস্থদের সাহায্য করেন।

এটা বিদ্যাসাগরের চিরদিনের স্বভাব।

একবার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশের কলেরা হয়। খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর মশাই ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। ডাক্তার রোগীর চিকিৎসা করেন আর বিদ্যাসাগর মশাই নিজের হাতে তর্কবাগীশের মল-মূত্র পরিষ্কার করে দেন। এই রোগীর সমস্ত ওষুধ-পত্রের দামও তিনি দিয়েছিলেন।

কোনো গরীবের অসুখ করলে বিদ্যাসাগর মশাই নিজে গিয়ে সেই রোগীর সেবা করতেন আর তার ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করতেন।

আর একবার বিদ্যাসাগরের বাড়ির কাছে একজন চাকরের সাংঘাতিক কলেরা হয়। তাতে তার মনিব তাকে হাত ধরে রাস্তায় বের করে দেন।

মরণাপন্ন রোগী রাস্তায় এসে অসহায় হয়ে পড়লো। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন, আর সেই রোগীকে বুকে করে তুলে এনে তাঁর নিজের বিছানায় শুইয়ে দিলেন আর সেবা-শুশ্রূষা করে সেই মৃত্যু-পথের যাত্রীকে ভালো করে তুল্লেন।

বিদ্যাসাগর এরকম কত অসহায় রোগীকে যে সেবা করেছেন তার আর হিসেব-কিতেব নাই।

তাঁর প্রাণের পরিচয় যে পেয়েছে সেই ধন্য ধন্য করেছে। একজন রোগী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন, "তাঁহার অকৃত্রিম দয়ার কথা আর কত বলিব। সেই সব কথা স্মরণ হইলে সেই দয়াবতারের সেই করুণ মূর্তি হৃদয়ে জাগরূক হয়। তাঁহার কথা ভাবিলে বুক ফাটিয়া যায়,—চক্ষের জল রাখিতে পারি না। আহা, তেমন

দয়ালু-দাতা কি আর এ জগতে দেখিব।”

বিদ্যাসাগর মশাই সুবিধা পেলেই আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব আর গুণবান লোকের চাকরি করে দিতেন। কোনো কোনো সময়ে পরের জন্যে নিজের ক্ষতি স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হতেন না।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ খালি হয়। মার্শাল সাহেব, বিদ্যাসাগর মশাইকে ঐ পদ নিতে অনুরোধ করেন। ঐ পদের মাইনে ছিল তখন ৮০ টাকা।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন মাইনে পাচ্ছিলেন ৫০ টাকা। কিন্তু তবু তিনি কোনো কারণে ঐ ৮০ টাকার পদ গ্রহণ করতে অসম্মত হন।

—দশ—

বিদ্যাসাগর মশাই খুব জোরে জোরে হাঁটতে পারতেন। তাঁর যখন রোগে স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গেছল, তখনও তাঁর সঙ্গে কোনো বলিষ্ঠ যুবকও হেঁটে পারত না।

যখন কর্মাটারে যেতেন তখন তাঁর সঙ্গে হাঁটায় পাল্লা দিয়ে তাঁর যুবক আত্মীয়-স্বজনেরা পারতেন না। তিনি যেন ছুটতে ছুটতে পথ চলতেন।

তাঁর ছেলে নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে বলেছেন—“সংস্কৃত কলেজে কাজ করবার সময় একদিন বাবার বীরসিংহ গ্রাম থেকে একদিনে কলকাতায় আসবার দরকার হয়। তিনি যাত্রার উদ্যোগ করছেন এমন সময় মদন মণ্ডল নামে একজন পাইক বাবাকে

বল্ল, 'আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতায় যাব।' বাবা তাই শুনে বল্লেন, 'তুমি আমার সঙ্গে হাঁটতে পারবে?' সে রাজি হয়ে চল্ল বাবার সঙ্গে। ৪৫ ক্রোশ পথ চলবার পর মদন দেখলো বাবা তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছেন। অনেকখানি পথ ছুটে গিয়ে মদন বাবাকে ধরলো। কিন্তু আর কিছুটা পথ গিয়ে মদন মণ্ডল বাবাকে বল্ল, 'আজ আর পথ চলতে পারছি না—এই চটিতে রাত কাটানো যাক, কাল কলকাতায় যাব।' বাবা হেসে বল্লেন, 'আমার আজই কলকাতায় যাবার প্রয়োজন। তুমি এই পয়সা নিয়ে চটিতে বিশ্রাম কর, আমি চল্লাম।' এই বলে বাবা হন্‌হন্‌ করে পথ চল্লেন, মদন চটিতে থেকে গেল।"

বিদ্যাসাগর মশাই আগে একদিনেই হেঁটে কলকাতা থেকে বাড়ি যেতেন, আর বাড়ি থেকে একদিনেই হেঁটে কলকাতায়, আসতেন। মাঝখানে এক জায়গায় একটি ডাব খেতেন মাত্র।

তিনি অনেক সময় সঙ্গীদের ভারী বোঝা প্রয়োজন হলে মাথায় করে পথ চলতেন। তিনি যখন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখনও এই কাজ করেছেন।

একদিন তিনি মোট মাথায় পথ চলবার সময় কলেজের দারোয়ানদের সামনে পড়ে যান। তারা তো ধারণাই করতে পারে নাই, তাদের কলেজের সর্বাধ্যক্ষ এই ভাবে অন্যের মাল মাথায় নিয়ে চলেছেন। তারা বিদ্যাসাগরের মাথা থেকে মাল নামিয়ে নিজেরা মাথায় বইতে চায়, কিন্তু বিদ্যাসাগর তাদের মিষ্টি কথায় বিদায় দেন।

বাড়ি গেলে বিদ্যাসাগরের প্রায়ই এ-বাড়ি ও-বাড়ি নিমন্ত্রণ হোত। তিনি ভাইদের নিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যেতেন। পথে মজা করবার জন্যে নালা-নর্দমা দেখলেই লাফিয়ে পার হতেন আর ভাইদেরও লাফিয়ে

পার হতে বলতেন। তাঁরা লাফ দিতে গিয়ে নালার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। তাই দেখে বিদ্যাসাগর ছেলেমানুষের মত 'হো-হো' করে হেসে উঠতেন।

একদিন বিদ্যাসাগর মশাই বীরসিংহ গ্রামে মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেলেন একজন খুব বুড়ো চাষী মাথায় ভারী মোট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্যাসাগর মশাই প্রশ্ন করে জানলেন লোকটির বাড়ি সেখান থেকে প্রায় ৫।৬ মাইল দূরে। তার যুবক ছেলে বুড়ো বাপের মাথায় এই বিরাট মোট চাপিয়ে তাকে বাড়ি পাঠিয়েছে।

থুত্থুড়ে বুড়ো, একেই প্রায় অথর্ব, তাতে ভারী মোট মাথায় একে-বারে অচল হয়ে পড়েছে।

বুড়োর এই দশা দেখে আর ছেলের কীর্তির কথা শুনে বিদ্যাসাগরের চোখ ফেটে জল এলো। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বুড়োর বোঝা নিজের মাথায় তুলে বুড়োকে তার সেই দূরের বাড়িতে পৌছে দিলেন।

বিদ্যাসাগর মশাই সম্বন্ধে এরকম কত গল্প শোনা যায়। তাঁর মাতৃ-ভক্তির বুঝি তুলনা হয় না।

যখন তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কাজ করছেন, তখন বীরসিংহ গ্রামে তাঁর মেজ ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়। এই বিয়েতে বিদ্যাসাগরের মা চিঠি লিখলেন—"ঈশ্বর, তুমি অবশ্য আসিবে।"

মায়ের চিঠি পেয়ে বিদ্যাসাগর মশাই অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি মার্শাল সাহেবের কাছে ছুটি চাইলেন, কিন্তু ছুটি পেলেন না।

কিন্তু মাতৃভক্ত বিদ্যাসাগর স্থির করলেন,—ছুটি না পেলেও তিনি কাজ ছেড়ে মাকে দেখতে যাবেন।

এই কথা শুনে অবশেষে মার্শাল সাহেব ছুটি মঞ্জুর করলেন। ছুটি

পেয়ে বিদ্যাসাগর বিকাল তিনটার সময় একটি চাকরকে সঙ্গে করে বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

তখন বর্ষাকাল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর প্রবল বর্ষণ হচ্ছে।

এই দুর্যোগের মধ্যে বিদ্যাসাগর হেঁটে চল্লেন দেশের দিকে। চলতে চলতে ভৃত্য শ্রীরাম পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর তাকে একটি দোকানে বসিয়ে কিছু জলযোগ করিয়ে পয়সা দিয়ে বল্লেন, "শ্রীরাম, তুমি একটু বিশ্রাম করে বাড়ি যেও।"

বিদ্যাসাগর একাই চলে এলেন দামোদর নদের তীরে। এসে দেখলেন দামোদর নদ তখন কূলে কূলে ভরা। কী ভয়ঙ্কর স্রোত তাতে, আর ঝোড়ো বাতাসে উত্তাল ঢেউ উঠছে বারে বারে।

এই দুর্যোগে নদীতে একটি নৌকাও চলছে না,—পার হবার কোনো উপায় নাই। নিরুপায় বিদ্যাসাগর "মা-মা" বলতে বলতে সেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আর অনেক কষ্টে পার হয়ে গেলেন।

—এগারো—

এ রকম মাতৃভক্ত ছেলের কথা তোমরা শুনেছ কি ?

রাত্রি নয়টার সময় ছুটতে ছুটতে বিদ্যাসাগর বাড়িতে এলেন। এসে দেখেন বর বিয়ে করতে চলে গেছে, আর মা ঘরে দরজা বন্ধ করে অনাহারে পড়ে আছেন।

বিদ্যাসাগরের সাড়া পেয়ে মা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আর ছেলেকে দেখে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন—বিদ্যাসাগরও কাঁদতে লাগলেন।

শেষে সমস্ত বৃত্তান্ত ছেলের মুখে শুনে, তাঁর দেরীতে আসার কারণ বুঝতে পেরে, ছেলেকে নিয়ে খেতে বসলেন।

ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা লিখতে পারতেন। সে কবিতা-গুলি যেমন সুন্দর তেমনি সহজ-পাঠ্য। একবার কলেজে তাঁর কবিতায় মুগ্ধ হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে ২০০ টাকা পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর তা না নিয়ে কলেজেই সে টাকাটা জমা রাখতে বল্লেন। শেষে তাঁর অনুরোধে চারজন পণ্ডিতকে এই পুরস্কারের টাকাটা ভাগ করে দেওয়া হোলো।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ভর্তি হবার পর ঈশ্বরচন্দ্র সুপাঠ্য বাংলা গদ্য-পাঠ্য লিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি "বাসুদেব-চরিত" লেখেন।

এই বইখানি বাংলা ভাষার একটি আদর্শ গ্রন্থ। হিন্দু ছেলেদের এটি অবশ্য-পাঠ্য।

এই বাসুদেব-চরিতে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ লীলার কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু কলেজের খ্রীষ্টান কর্তৃপক্ষ বইখানা অনুমোদন করলেন না। তখনকার দিনে এমন সুন্দর বাংলা বই আর ছিল না।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় সে বই পরে আর ছাপা হয় নাই। বিদ্যাসাগর মশাই এ সময়ে সাহেব সিভিলিয়ানদের পরীক্ষক হতেন। কোনো সাহেব পরীক্ষায় কৃতকার্য না হলে দেশে ফিরে যেত। তাই অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে একটু বেশী বেশী নম্বর দিতে বলতেন।

কিন্তু ন্যায়পরায়ণ বিদ্যাসাগর সে কথা শুনতেন না। উচিত মতই পরীক্ষার খাতা দেখতেন। তিনি অধ্যক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, "আপনি

এ রকম অন্যায় অনুরোধ করলে, আমি চাকরি ছেড়ে দেব।"

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে থাকবার সময় তাঁকে সবাই অত্যন্ত ভক্তি করত। কলেজের সামান্য দারোয়ান থেকে উপরওয়ালারা পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত সম্মান করত। সিভিলিয়ান সাহেবরাও তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত।

এই সময়ে একদিন একটা কাণ্ড ঘটলো।

হিন্দু-কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কার সাহেব। বিদ্যাসাগর একদিন কোনো কাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

সাহেব তখন টেবিলের উপর পা তুলে বসেছিলেন। তিনি সেই অবস্থাতেই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে কথা বল্লেন।

এতে বিদ্যাসাগর মশাই নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। এ কী রকম সভ্যতা? তিনি সেদিন কিছু বল্লেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সাংঘাতিক চটে গেলেন।

আর একদিন কার সাহেব এসেছেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে। বিদ্যাসাগর এইবার তার শোধ তুল্লেন। তিনিও টেবিলের উপর জুতো শুদ্ধ পা তুলে দিয়ে,—সাহেবের কথার উত্তর দিলেন। তাঁকে বসতে পর্যন্ত বল্লেন না।

সাহেবও খাপ্পা হয়ে ফিরলেন,—কী, একজন দেশী পণ্ডিতের এতদূর স্পর্ধা, সাহেবকে এ রকম অপমান করা?

তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্যাসাগরের এই ব্যবহারের কথা জানালেন। বিদ্যাসাগরের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হোলো।

বিদ্যাসাগর তার উত্তর দেন—"এই সভ্যতা আমি কার সাহেবের কাছে আগেই শিখেছি। তিনিও আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার

করেছিলেন।" তাঁর উত্তর শুনে সবাই তো হতবাক।

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের বারো বছরের ভাই হরচন্দ্রের, হঠাৎ ওলাউঠায় মৃত্যু হয়।

এই ব্যাপারে বিদ্যাসাগর মশাই এ রকম মর্মাহত হলেন যে পাঁচ ছয় মাস এক রকম আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন। তাঁর জীবনের সমস্ত সুখ-শান্তি যেন হারিয়ে ফেল্লেন।

এই দুর্ঘটনার পর কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্তের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হয়। এতে তেজস্বী বিদ্যাসাগর কলেজের কাজ ছেড়ে দিলেন।

কাজ ছেড়ে দিতে, বিদ্যাসাগরের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই অবাক হলেন। কেউ কেউ বল্লেন—"ঈশ্বরচন্দ্র, চাকরি ছেড়ে দিলে বটে, কিন্তু এতবড় সংসার চালাবে কিসে ?"

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—"বরং আলু-পটল বেচব, মুদীর দোকান করব, তবু যে কাজে মান থাকে না, তা আর করব না।"

এই সময়ে বিদ্যাসাগর অনেকগুলি অনাথ ছেলেকে ভরণ-পোষণ করাতেন। তিনি কাউকেই বঞ্চিত করেন নাই। কোনো রকমে তিনি খরচ চালিয়ে যেতেন। কেউ তাঁকে কোনো দিন মলিন বা বিষণ্ণ দেখেন নাই। তাঁর মুখ দেখে মনে হোত না, তাঁর মনে কোনো কষ্ট কি দুঃখ আছে।

—বারো—

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই হিন্দী "বৈতাল-পঁচ্চিসী" নামক বইয়ের বাংলা অনুবাদ করেন। এই বইটি পড়ে তখনকার দিনে অনেকেই মুগ্ধ হন।

বিদ্যাসাগর মশাই হিন্দী ভাষা খুব ভালো বুঝতেন। লোকে তাঁকে সংস্কৃত-পণ্ডিত বলেই জানত, কিন্তু তাঁর মুখে ইংরাজী সেক্‌স্‌পীয়ারের আবৃত্তি শুনে সকলের তাক্ লেগে যেত।

হিন্দী "বৈতাল-পঁচিসী" বইটি ছিল অনেক ত্রুটিতে ভরা, কিন্তু বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুবাদ "বেতাল-পঞ্চবিংশতি"র ভাষা ছিল প্রাঞ্জল মধুর আর বিশুদ্ধ। তবে প্রথম সংস্করণের ভাষা ছিল একটু কঠিন আর সমাস-বহুল। যেমন—"উত্তাল রঙ্গমালাসঙ্কুল উৎফুল্ল ফেননিচয়-চুম্বিত ভয়ঙ্কর তিমিমকরনক্রচক্র ভীষণ স্রোতস্বতীপতি প্রবাহ মধ্য হইতে সহসা এক দিব্য তরু উদ্ভুত হইল।" এই রকম ছিল প্রথম সংস্করণের ভাষা। পরে অবশ্য বিদ্যাসাগর মশাই ভাষা আরো সোজা করে দেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মশাই মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে পরামর্শ করে "সংস্কৃত-যন্ত্র" নামে একটি ছাপাখানা করেন। এই ব্যাপারে তাঁকে ছয়শ' টাকা ধার করতে হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর মশাই কবি ভারতচন্দ্রকে খুব পছন্দ করতেন। তিনি বলতেন, "কালিদাস যেমন সংস্কৃতে, ভারতচন্দ্র তেমনি বাংলায়। ভারতচন্দ্র বাংলার খাঁটি কবি।"

ভারতচন্দ্রের পর দাশরথি রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আর রসিকচন্দ্র রায় বিদ্যাসাগর মশাইয়ের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই মার্শম্যান সাহেবের লেখা "History of Bengal" নামে বইখানার বাংলা অনুবাদ করেন। এই বইখানার আদর হয়েছিল যথেষ্ট। এর ভাষা ছিল বড় সুন্দর।

বিদ্যাসাগরের হাতের লেখাও ছিল বড় সুন্দর, যেমনি বাংলা তেমনি ইংরাজী। মুক্তার মত তাঁর ইংরাজী হাতের লেখা দেখে সাহেবরা পর্যন্ত প্রশংসা করত।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের ছেলেরা "শুভঙ্করী" নামে একটি পত্রিকা বার করেন। বিদ্যাসাগর মশাই এই কাগজে 'বাল্যবিবাহের দোষ দেখিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন।

এই সময়ে দেশে অনেক রকম কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে 'বাল্যবিবাহ'ও একটি।

বিদ্যাসাগর মশাই এই রীতির বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। তাঁকে কেউ কেউ সমর্থন করলেন, আবার কেউ কেউ বা বিদ্রূপ করতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর মশাই গ্রাহ্য করলেন না, আন্দোলন চালাতে লাগলেন।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বড় ছেলে শ্রীনারায়ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরেই বিদ্যাসাগরের আর এক ভাই মারা যান। তাঁর পঞ্চম ভাই হরিশচন্দ্র আট বছর বয়সে কলকাতায় আসেন আর কিছুদিন বাদেই কলেরায় মৃত্যুবরণ করেন।

এই ভাইয়ের মৃত্যুতে বিদ্যাসাগর মশাই আবার বড় আঘাত পেলেন। এই ভাইটি বিয়ের বাজনা শুনে বিদ্যাসাগরকে একদিন বলেছিলেন, "দাদা, আমার বিয়ের সময় এই রকম বাজনার ব্যবস্থা কোরো।"

তার মৃত্যুর পর কোনো বিয়ের বাজনা শুনলেই বিদ্যাসাগরের চোখ জলে ভরে উঠত। হরিশচন্দ্রের মিষ্টি আবদারের কথা তাঁর মনে পড়ে যেত।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। এই পদের মাইনে ছিল ৯০ টাকা।

এই কাজের জন্যে যখন বিদ্যাসাগর মশাইকে অনুরোধ করা হয় তখন তিনি স্পষ্টই বলেছিলেন, আমাকে যদি শীঘ্রই কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে আমি এই পদ গ্রহণ করিব।"

তারপর এক বছর পরেই অর্থাৎ ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে বিদ্যাসাগর মশাই সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন।

এই সময়ে সংস্কৃত কলেজে এই কয়টি বিভাগ ছিল,—ব্যাকরণ বিভাগ, সাহিত্য বিভাগ, অলঙ্কার শ্রেণী, জ্যোতিষ ও বণিক শ্রেণী স্মৃতি বা আইন শ্রেণী, ন্যায় শ্রেণী, আর ইংরাজী বিভাগ।

এই ইংরাজী বিভাগের শ্রেণীতে অনেক সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রেরা পড়ত।

বিদ্যাসাগর মশাই কয়েকজন ইংরাজের চরিত্র নিয়ে "জীব-ন চরিত" নামে একটি বই লেখেন। এটি একজন ইংরাজের লেখা বইয়ের অনুবাদ মাত্র।

এই অনুবাদও হয়েছিল চমৎকার। তবে বিদ্যাসাগর নিজেই বলেছেন, 'এই অনুবাদে কোনো কোনো শব্দের ত্রুটি আছে।' তবুও বইখানার যথেষ্ট খ্যাতি হয়েছিল।

শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের নাতি সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু ছিলেন বিদ্যাসাগরের ইংরাজী ভাষার শিক্ষাগুরু। তিনি তাঁর "জীবন-চরিত" পড়ে বিদ্যাসাগরকে স্বদেশের লোকদের চরিত্র নিয়ে জীবনী লিখতে অনুরোধ করেন।

বিদ্যাসাগর মশাই এ বিষয়ে রাজী হয়েছিলেন এবং কিছু বইও জোগাড় করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে ওঠে নি।

—তেরো—

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ করে বিদ্যাসাগর মশাই কলেজের শিক্ষা-পদ্ধতির অনেক পরিবর্তন করতে চেষ্টা করেন। তখনকার দিনের ছাত্রেরা তার অমানুষিক পরিশ্রম দেখে অবাক হয়ে যেতেন।

এই সময় বিদ্যাসাগর মশাই কলেজের নির্দিষ্ট কাজ ছাড়াও বাইরে অনেক কাজও করতেন। তিনি ছিলেন কর্মবীর। তিনি একটুও আরাম-বিরাম করতে জানতেন না। কাজই ছিল তাঁর ধর্ম, তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান।

এত বড় পদের অধিকারী হয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। অহঙ্কার কাকে বলে তা জানতেন না। ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশতেন আর ছেলের মত ব্যবহার করতেন।

বিদ্যাসাগর মশাই সে সময়ে প্রায়ই সংস্কৃত কলেজে থাকতেন। কলেজের ছুটির পর অনেক ছাত্র তাঁর কাছে হাজির হোত। তিনি হাসিমুখে সকলকেই স্নেহের সম্ভাষণ করতেন, আদর করতেন। তিনি তাদের সঙ্গে যেমন জ্ঞানের কথাও বলতেন, তেমনি আবার রসিকতাও করতেন। ছাত্রেরা আবার প্রায়ই তাঁর কাছ থেকে ভালো ভালো খাবার, সন্দেশ, রসগোল্লা লাভ করতেন। ছাত্রেরা বিদ্যাসাগরের ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন।

বিদ্যাসাগর মশাই ছাত্রদের "তুই" বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর মুখে এই মিষ্টি 'তুই' ডাক শুনে ছাত্রেরা তাঁকে অতি নিকট আত্মীয়ের মত মনে করতেন।

কিন্তু এই নিকটতম আত্মীয়ই আবার যখন কঠিন হতেন তখন তাঁকে ভয় করত না কে? কার সাধ্য ছিল তখন তাঁর কাছে যায়। কিন্তু এই কঠোরতা ছিল ক্ষণস্থায়ী। একটু পরেই আবার যে কে সেই। আবার সেই হাস্যময় কোমল মূর্তি, আবার সেই কঠোর মুখে ফুটে উঠতো একটা শোভনীয় স্বর্গীয় শ্রী।

বিদ্যাসাগর মশাই ছাত্রদের শারীরিক শাস্তি দিতে চাইতেন না। একদিন তিনি দেখলেন সংস্কৃত কলেজের কোনো ক্লাসের অধ্যাপক ছাত্রদের ক্লাসে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। তিনি অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে তাঁকে এই কাজ করতে বারণ করে দিলেন।

বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত রসিক। তিনি চিরকালই সময় বুঝে লোক বুঝে রহস্য করতেন। তিনি স্বাভাবিক রহস্যপটু ছিলেন।

তাঁর এক ইংরাজ বন্ধু বলতেন—"He is the most cheerful of all my friends."

বিদ্যাসাগর মশাই বন্ধুদের বাড়িতে গেলে আনন্দের ফোয়ারা ছোটাতেন। কত হাসি, ঠাট্টা, গল্পে সময় কাটাতেন। যাকে বলে মজলিসী লোক, তিনি ছিলেন তাই। কথায় কথায় দিতেন মজার মজার সব উপমা। রোজ নতুন নতুন গল্প, রোজ নতুন নতুন উপমা। বন্ধুরা হেসে মেতে উঠতেন।

কিন্তু এত রসিকতার মধ্যেও নিজের কাজ ভুলতেন না। নিজের কর্তব্য ঠিক ঠিক করে যেতেন এত আড্ডার মধ্যেও।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ পাবার ৫।৬ মাস পরেই বিদ্যাসাগর মশাই ভীষণ অসুখে পড়েন, কিন্তু আবার শীগ্‌গিরই সেরে ওঠেন। এই সময় তাঁর মাথার ব্যথার সূচনা হয়। সে সময়ে তাঁর চেহারা খুব বলিষ্ঠ ছিল বলে তিনি সহজে কাতর হতেন না।

তিনি তখন রীতিমত ব্যায়াম-চর্চা করতেন,—সকলে সন্ধ্যায় মুগুর ভাঁজতেন আর ডন্ ফেলতেন। এতে তাঁর শরীরে এত রক্ত জন্মে গিয়েছিল যে ডাক্তারেরা তাঁর একটা শক্ত অসুখ হবে সন্দেহ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তখন ভালো করে ঘাড় বেঁকাতে পারতেন না। শেষে ডাক্তারী চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো কর্তব্য বলে তিনি মনে করতেন। এই বিষয়ে তিনি প্রাণপণে পরিশ্রম করতেন। অনেক বিরুদ্ধ-বাদীর সঙ্গে তাঁর অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা করতে হয়েছিল।

বিদ্যাসাগর মশাই বুঝতে পেরেছিলেন মেয়েদের মধ্যে জাগরণের সাড়া আনতে হলে তাদের আগে লেখাপড়া শেখাতে হবে। তিনি বুঝেছিলেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে হিন্দুর সংসার সুখের হবে। এই জন্যে তিনি কম চেষ্টা করেন নাই।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল বিদ্যাসাগর মশাই Rudiments of knowledge নামে এক ইংরাজী বইয়ের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম হয় 'বোধোদয়'।

এই 'বোধোদয়ের ভূমিকায় বিদ্যাসাগর মশাই লিখেছিলেন "সুকুমারমতি বালক-বালিকারা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেক, এই আশায় অতি সরল ভাষায় লিখিবার নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়াছি : কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না।"

কিন্তু বোধোদয়ের ভাষাও শিশুদের পক্ষে জায়গায় জায়গায় শক্ত ছিল।

বোধোদয়ের ভাষা মধ্যে মধ্যে এরকম ছিল, "ঔজ্জ্বল্য ব্যাতিরিক্ত," "ন্যূনাধিক্যবশতঃ", "গম্ভীর শব্দজনক," "ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য", "উজ্জ্বলতা অনুসারে তারতম্য।"

আর তা ছাড়াও মধ্যে মধ্যে এমন সব কথা ছিল যা শিশুদের পক্ষে বোঝা সহজ নয়।

বোধোদয়ের মধ্যে আবার অনেক অসঙ্গতিও ছিল।

—চৌদ্দ—

সংস্কৃত কলেজে শুধু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় আর বৈদ্য জাতির ছাত্রেরাই পড়তে আসত। বিদ্যাসাগর ভাবলেন এই কলেজে শূদ্র ছাত্রেরাও পড়বে না কেন?

অধ্যক্ষ হবার পর তিনি শিক্ষা-সভায় এই প্রস্তাব করলেন। তাতে বড় বড় অধ্যাপকেরা প্রবল আপত্তি তুল্লেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর স্থির করলেন, যে করেই হোক, কলেজে শূদ্র ছাত্রদের নিতেই হবে।

তিনি বল্লেন, "যদি এই কাজে সফল না হই, তবে আমি কাজ ছেড়ে দেব।"

প্রবল আন্দোলনের পর কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সম্মত হন। সংস্কৃত কলেজে শূদ্র ছাত্রেরাও স্থান পায়।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই 'উপক্রমণিকা' ব্যাকরণ প্রকাশ

করেন। সাধারণের সংস্কৃত শেখার পক্ষে এমন সহজ ব্যাকরণ আর নাই।

একবার বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে ভীষণ ডাকাতি হয়। তখন বিদ্যাসাগর মশাই গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়িতেই ছিলেন। অনেকগুলি ডাকাত এসেছিলে, আর তারা বিদ্যাসাগরের বাড়ির সমস্ত টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্তর লুটে-পুটে নিয়ে যায়।

এতে বিদ্যাসাগর মশাই কিছুই বিচলিত হলেন না। পরিবারদের নিরাপদে রাখবার জন্যে তাঁদের নিয়ে খিড়কী দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মাত্র।

পরদিন সকালে বিদ্যাসাগর মশাই বন্ধুদের সঙ্গে কপাটি খেলছিলেন, —এমন সময় তদন্তকারী দারোগা তাঁর বাড়িতে এসে অবাক হয়ে যায়। যাঁর বাড়িতে কাল রাত্রে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়ে যাঁকে সর্বস্বান্ত করেছে,—তিনি কিনা নিশ্চিন্ত মনে বন্ধুদের সঙ্গে কপাটি খেলছেন!

এখানে বলে রাখা দরকার বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বাংলার স্কুলে স্কুলে ছুটির প্রচলন করেন।

এইবার বিদ্যাসাগর মশাই ছেলেদের নীতিশিক্ষার জন্য একটি মুখরোচক বই লেখেন 'কথামালা'।

এই 'কথামালা' পড়ে নাই এমন ছেলে বাংলায় নাই।

'উপক্রমণিকা'র পর বিদ্যাসাগরের 'ঋজুপাঠ' প্রথম ভাগ লেখা হয় তারপর 'ঋজুপাঠ' দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ হয়।

এই 'ঋজুপাঠ' দু ভাগই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পুরাণের সার সঙ্কলন। ছাত্রদের অত্যন্ত উপযোগী।

তারপর 'ঋজুপাঠ' তৃতীয় ভাগ বার হয়। এই বইখানা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য ছিল।

এর পরই বিদ্যাসাগর মশাইয়ের ব্যাকরণ-কৌমুদীর প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বার হয়। পরের বছর ব্যাকরণ-কৌমুদীর তৃতীয় ভাগ ছাপা হয়।

এই তিনভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী হচ্ছে উপক্রমণিকার পরের পাঠ্য বই। এই বইগুলো পড়ে ছেলেরা সংস্কৃতের অনেক কঠিন জিনিস অতি সহজে শিখতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর মশাই শুধু বই লিখেই চুপ করে ছিলেন না, যে সকল সভায় পাঠ্য-পুস্তক সম্বন্ধে নানা রকম আলোচনা হোত, তিনি সেই সব সভায় যোগ দিতেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই বীরসিংহ গ্রামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় খোলেন। এই বিদ্যালয়ে অনেক চাষাভুষোর ছেলে রাত্রিবেলা এসে পড়াশুনা করত। বিদ্যাসাগর মশাই নিজের টাকায় এই বিদ্যালয়ের জমি কেনেন, আর ঐ টাকায় স্কুলবাড়িও তৈরি হয়।

আর একটা মজার কথা এই যে, অতবড় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নিজের হাতে কোদাল ধরে প্রথমেই এই স্কুলের ভিত্তির মাটি খুঁড়েছিলেন।

এই সময় বীরসিংহ গ্রামে একটি মেয়েস্কুলও তৈরি হয়।

প্রতিমাসে এই স্কুলের শিক্ষকদের মাইনে ও বই শ্লেট কেনা বাবদ চারশো টাকা খরচ হোত।

বিদ্যাসাগর মশাই নিজেই এই টাকা যোগাতেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কতদিকে দৃষ্টি।

গ্রামের দুঃস্থ লোকেদের সেবার জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করলেন। সকলে বিনাপয়সায় এখানে ওষুধ পেত ; বিনা পারিশ্রমিকে ডাক্তারেরা রোগী দেখতেন। শুধু তাই নয় গরীব দুঃখীরা বিনাপয়সায় ওষুধ ও পথ্য পেত।

এতেও মাসে একশো টাকা খরচ হোত, বিদ্যাসাগরই তার ব্যবস্থা করতেন।

তখন বিদ্যাসাগর মশাই কলেজে মাত্র তিনশত টাকা মাইনে পেতেন আর তাঁর বই থেকেও কিছু আয় হোত।

প্রায় সব টাকাই তাঁর এই রকম করে খরচ হয়ে যেত।

কিছুই সঞ্চয় হোত না। স্বভাবদাতা কি আর সঞ্চয়ের কিছু আশা করতে পারেন!

—পনেরো—

উন্নতির পর উন্নতি। বিদ্যাসাগরের ক্রমেই পদোন্নতি হচ্ছে। তিনি এর পরে হলেন স্কুলের ইন্‌স্পেক্টর। সবশুদ্ধ মাইনে হোলো পাঁচশো টাকা।

ইন্‌স্পেক্টর হয়ে বিদ্যাসাগর মশাই হুগলী বর্ধমান আর নদীয়া জেলার অনেক গ্রামে বাংলা স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন।

তাঁকে প্রায়ই মফস্বলে যেতে হোত। তখন পালকি করে যাতায়াত করতে হোত। অনেক সময় বিদ্যাসাগর মশাই পথে কোনো অসুস্থ

বা দুর্বল লোক দেখলে তাকে নিজের পালকিতে তুলে দিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে চলতেন। তারপর সামনে কোনো চটি পেলে তাকে সেখানে রেখে চটি কর্তাকে তার খরচের টাকা পয়সা দিয়ে যেতেন।

বিদ্যাসাগরের দয়ার সীমা নাই। কেউ তার অভাব জানালে বিদ্যাসাগর আর স্থির থাকতে পারতেন না। তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন।

কত অনাথ ছেলেকে তিনি কতভাবে সাহায্য করেছেন তার আর কি কেউ হিসাব রাখে?

একবার মফস্বলে একটি দুঃখী ছেলের কষ্টের কথা শুনে তিনি হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন আর তার সমস্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই রকম কতজনের অভাব যে তিনি দূর করেছিলেন তার আর ঠিক ঠিকানা নাই।

'মা' নামটি শুনলে তিনি আর স্থির থাকতে পারতেন না। কেউ যদি এসে মিথ্যে করেও বলত আমার 'মা নাই' ব্যস। বিদ্যাসাগর মশাই আকুল হয়ে পড়তেন, তিনি তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতেন।

বিদ্যাসাগরের এই দুর্বলতা জেনে কত লোক যে তাঁকে ঠকিয়ে পয়সা নিয়েছে তার আর সীমা সংখ্যা নাই।

কেউ 'মা, মা' করে গান গাইলে তিনি তাঁকে কাছে ডেকে গান শুনতেন।

বিদ্যাসাগর মশাইয়ের এক আত্মীয় জগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় বেশ ভালো গান গাইতে পারতেন। বিদ্যাসাগর মশাই প্রায়ই তাঁকে বাড়িতে এনে তাঁর মুখে শ্যামা সঙ্গীত শুনতেন। সত্যিকারের গান

শুনবার সখ বিদ্যাসাগরের ছিল না, শুধু 'মা'র নাম শুনতে তাঁর প্রাণ মেতে উঠত।

আহা, কী অসম্ভব মাতৃভক্তি! এরকম মাতৃভক্ত ছেলে আর কি সহজে দেখা যায়?

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির বুঝি তুলনা মেলে না। এই মায়ের ডাকেই তিনি বর্ষার ভরা দামোদর নদ সাঁত্‌রে পার হয়েছিলেন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে। আজকালকার ছেলেরা কি তা ধারণা করতে পারে?

শুধু বাবা-মা আর আত্মীয় স্বজন কেন বন্ধু-বান্ধব, চেনা-শোনা সকলকেই তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যাঁর একবার পরিচয় হোতো সেই তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে যেত।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হবার পর বিদ্যাসাগর মশাই অনেক গরীব দুঃস্থকে মাসিক সাহায্য করতেন। বিদ্যাসাগরের গুণের কথা কি আর বলে শেষ করা যায়?

১২৪৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বিদ্যাসাগরের বাংলা 'শকুন্তলা' ছাপা হয়।

যদিও সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র ভাবানুবাদ এটি, কিন্তু এমন সুন্দর বাংলা বই আগে আর কেউ পড়েনি। এর গল্পাংশের সঙ্গতি আর সৌন্দর্য ছিল অপূর্ব।

যদিও এই বইটি সংস্কৃত বইয়ের ভাবানুবাদ, তবু এমন সুন্দর অনুবাদের বুঝি তুলনা হয় না। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলার' সংস্কৃত যেমন মধুর, এই বাংলা 'শকুন্তলা'র ভাষাও তেমনি মধুর।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে শকুন্তলার, মহর্ষি কণ্ব আর তাঁর দুই

সখীর শোকের ছবিটি বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বইখানিতে এমন সুন্দর ভাবে ফুটিয়েছেন, যে পড়লে চোখের জল রোধ করা যায় না।

তবুও বিদ্যাসাগর মশাই বিনয়বশত বলেছেন, "বইটিতে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেছে, কয়েক জায়গায় কিছু কিছু বাদ দিতে হয়েছে, আর কয়েকটি অংশ একটু ঘুরিয়ে লিখতে হয়েছে। কালিদাসের বহু কবিত্ব সৌন্দর্যও আমার অক্ষমতার জন্য পরিত্যাগ করতে হয়েছে।"

তবুও বিদ্যাসাগরের বাংলা 'শকুন্তলা' একটি অনবদ্য বই। যাঁরা ভালো সংস্কৃত জানতেন না তাঁরাও এই বইখানি পড়ে সংস্কৃত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'র মর্ম বুঝতে পেরেছেন। এই বইখানিতে কিছু কিছু অমৃতের স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।

—ষোলো—

এইবার হিন্দুসমাজে বিদ্যাসাগরের অখ্যাতি হতে আরম্ভ করলো। বিদ্যাসাগর বিদ্বান, বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, বিদ্যাসাগর দয়াময়,—কিন্তু এ আবার কী কাণ্ড আরম্ভ করলেন তিনি। এ-যে অসহ্য।

কী করলেন বিদ্যাসাগর?

বিদ্যাসাগর ছোট ছোট বিধবা মেয়েদের আবার বিয়ে দিতে বলছেন। শুধু বলছেন না, আন্দোলন আরম্ভ করেছেন।

হিন্দুসমাজের গোঁড়ারা বেঁকে বসলেন। হোক্ বিদ্যাসাগর হিন্দু, ব্রাহ্মণ আর পণ্ডিত, তাঁর এতটা আস্পর্ধা হোল কেন—তিনি হিন্দু সমাজের সনাতন প্রথার উপর হাত দিচ্ছেন কেন?

বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিবাদ করতে আরম্ভ করলো, তাঁকে বাধা দিতে লাগলো, মন্দ বলতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর মশাই শাস্ত্র ঘেঁটে দেখালেন। 'বিধবা-বিবাহ' অশাস্ত্রীয় নয়। তিনি শাস্ত্র থেকে ভূরি ভূরি প্রমাণ দিতে লাগলেন।

ছোট ছোট দুধের মেয়েরা স্বামীর মৃত্যুর পর চিরকাল বিধবা হয়ে দুঃখ ভোগ করবে, দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর কি করে তা সহ্য করবেন।

তখনকার দিনে খুব অল্প বয়সের মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হোত—তার স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা হয়ে যা কষ্ট ভোগ করত—বিদ্যাসাগর নিজের চোখে তা দেখেছেন।

না,—এ কিছুতেই হতে পারে না। এই প্রথা অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং অন্যায়।

বিদ্যাসাগর সঙ্কল্প করলেন এই কুপ্রথা দূর করতেই হবে।

প্রবল আন্দোলন চালালেন বিদ্যাসাগর। রাশি রাশি শাস্ত্রের প্রমাণ দিলেন, বলতে লাগলেন, "সব শাস্ত্রেই বিধবা-বিয়ের সমর্থন আছে।"

চারিধারে বাদ-প্রতিবাদ সুরু হোলো। সনাতনীরা ক্ষেপে উঠলেন বিদ্যাসাগরের উপর। সর্বনাশ করলো বিদ্যাসাগর!

নানান্ জায়গার ধর্মসভা থেকে প্রবল আপত্তি উঠলো।

কেউ কেউ আবার বিদ্যাসাগরের পক্ষ অবলম্বন করলেন। তাঁর মত সমর্থন করে দুইটি বই বার হোলো 'ব্রজবিলাস' আর 'রত্নপরীক্ষা' নামে।

এই বই দুটিতে সনাতনী পণ্ডিতদের আক্রমণ করা হয়েছিল। এই দুটির ভাষা ছিল একটু কুরুচি-পূর্ণ।

বিদ্যাসাগর মশাই 'বিধবা-বিবাহ-বিষয়িণী' নামে একটি ছোট বই

প্রকাশ করে প্রচার করেছিলেন। তাতে শাস্ত্রের সব অকাট্য যুক্তি ছিল।

এই সময়ে হিন্দু সমাজের তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ চলছিল—গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিচালিত হিন্দু, ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু আর তৃতীয় সম্প্রদায় হচ্ছেন ইংরাজী-সভ্যতা অনুসরণকারী হিন্দু।

এঁরা কেউ বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে, কেউবা তাঁর স্বপক্ষে হলেন।

বিদ্যাসাগরের এই কাজে অনেক ধনী লোক সাহায্য করেছিলেন। যে সব পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করেছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই তাঁদের নানা শাস্ত্র থেকে শ্লোক উদ্ধার করে দেখিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর এই বিষয়ে আরো কয়েকটি বই প্রকাশ করেছিলেন। ক্রমে জনসাধারণ বিদ্যাসাগরের এই আন্দোলন সমর্থন করতে আরম্ভ করল। পথে, ঘাটে, মাঠে সব জায়গাতেই নানা রকম গান হতে আরম্ভ করল।

শান্তিপুরে বিদ্যাসাগর-পেড়ে নামে একরকম কাপড় উঠেছিল। তার পাড়ে এই গান লেখা ছিল।

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম—
বিধবা রমনীর বিয়ের লেগে যাবে ধুম।" ইত্যাদি।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই বিষয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন—

"বাঁধিয়াছে দলাদলি, লাগিয়াছে গোল
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল।

কত বাদী, প্রতিবাদী, করে কত রব,

ছেলে বুড়ো আদি করি, মাতিয়াছে সব।" ইত্যাদি।

আরো অনেক সমসাময়িক কবি বিদ্যাসাগরের মত সমর্থন করে কবিতা লিখেছিলেন।

পাড়াগাঁয়ে চাষা-ভুষোদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম হোলো, "বিধবার বিয়ে দেওয়া বিদ্যাসাগর।"

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর এক হাজার লোকের নাম-সই করা এক আবেদন পত্র বিদ্যাসাগর মশাই ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেন।

এই আবেদনের বিরুদ্ধেও লোক লাগলো।

শেষে অনেক চেষ্টার পর বিধবা-বিয়ের আইন পাশ হলো।

এই বিধবা-বিয়ের আন্দোলনের জন্যে বিদ্যাসাগরের অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি তাতে বিচলিত হন নাই।

এর পর বিদ্যাসাগর মশাই কয়েকটি অল্প বয়সী বিধবা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

—সতেরো—

নানান্ ঝঞ্ঝাটের মধ্যে বিদ্যাসাগরের বই লেখার কাজ ঠিকই চলছিল।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তাঁর সুবিখ্যাত বই বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হোলো। তারপর সেই বছরেই ১৪ই জুন বার হোলো বর্ণ পরিচয় দ্বিতীয় ভাগ।

এই দুটি বই কত বাঙালী শিশুকে যে বিদ্যা শিখতে সাহায্য করেছে তা আর বলে শেষ করা যায় না।

বিদ্যাসাগর মশাই মফস্বলে কাজে যেতে যেতে পালকীর মধ্যে বসে এই বর্ণপরিচয় লেখেন।

প্রথম প্রথম কিন্তু এই বর্ণপরিচয়ের আদর হয় নাই। এতে বিদ্যাসাগর মশাই নিরাশ হয়ে পড়েন। কিন্তু ক্রমেই এর আদর বাড়তে থাকে।

এখন, এমন কোন্ বাঙালী শিশু আছে যে প্রথমে বর্ণপরিচয় পড়ে নাই।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' প্রকাশিত হয়। এই বইটিও ক্রমে বেশ খ্যাতি লাভ করে।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। বিদ্যাসাগর মশাই হলেন এর একজন সভ্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত শিক্ষা উঠিয়ে দেবার কথা হয়। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাই প্রবল আপত্তি করেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই জয়ী হন।

তখনকার ছোটলাট হেলিডে সাহেব বিদ্যাসাগরের অত্যন্ত বন্ধু ছিলেন,—তিনি বিদ্যাসাগরকে যথেষ্ট সম্মান করতেন।

বিদ্যাসাগর মশাই প্রায়ই ছোটলাটের বাড়িতে গিয়ে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতেন।

তিনি কি ভাবে ইংরাজ ছোটলাটের বাড়িতে যেতেন জানো? গায়ে একটা মোটা চাদর আর পায়ে সামান্য চটি জুতো পরে।

ছোটলাট হেলিডে সাহেবের অনুরোধে তিনি কয়েকদিন মাত্র চোগা-

চাপকান পরে গিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে,—কিন্তু জীবনে আর তা পরেন নাই।

এরপর কোনো কারণে তিনি হেলিডে সাহেবের উপর রাগ করে তাঁর নিজের চাকরি ছেড়ে দেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মশাই ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আর স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর। এই দুটি পদের মাইনে ছিল পাঁচশ' টাকা।

বিদ্যাসাগর মশাই হেলায় এই চাকরি ছেড়ে দিলেন।

চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে বিদ্যাসাগরের আত্মীয়-স্বজনেরা খুব ক্ষুব্ধ হলেন। অনেকেই তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—চাকরি ছেড়ে তিনি ভালো কাজ করেন নাই।

কোনো স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর তাঁকে বল্লেন, "বিদ্যাসাগর' তুমি ভালো কাজ করলে না। আজকালকার দিনে পাঁচশ' টাকা মাইনে পাওয়া সোজা নয়। এখন তোমার চলবে কি করে ?"

বিদ্যাসাগর মশাই একটু হেসে উত্তর দিলেন, "আত্মসম্মানই বড়, টাকা বড়নয়। যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারীর কাজ ছেড়েছিলাম, তখন আমার কি ছিল ? এখন তবু আমার লেখা বইয়ের কিছু আয় আছে।"

কাজ ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর মশাই স্বাধীন প্রাণে কাজ করবার অনেক পথ আবিষ্কার করলেন। এমনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পেরেছিলেন বলে বিদ্যাসাগর মশাই সভ্য সমাজে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিলেন।

চাকরি ছেড়ে বিদ্যাসাগর অসীম সাহসে সংসার-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর বই থেকে কিছু আয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি ঋণে ডুবে গিয়েছিলেন। তার উপর তাঁর আবার দান ধ্যান ছিল।

একবার বিদ্যাসাগর মশাই স্বাধীন ভাবে টাকা রোজগার করবেন বলে স্থির করলেন। তাঁর একটি ছাপাখানা ছিল। তিনি ঠিক করলেন এতে বই ছাপবেন আর দোকানে সেই বই বিক্রী করবেন।

এই ব্যাপারে তিনি কিছু লোক রাখলেন মাইনে দিয়ে। কিন্তু কোনো কোনো কর্মচারীর ব্যবহারে তিনি অসন্তুষ্ট হলেন আর ঠিক করলেন তাঁর একজন বন্ধুর উপর এই কাজের ভার দেবেন।

এই বন্ধুটি এসে যোগ দেওয়ায় বিদ্যাসাগরের কাজকর্মে অনেকটা শৃঙ্খলা ফিরে এলো আর আয়ের পথও অনেকটা প্রশস্ত হোলো।

যে প্রেসে বিদ্যাসাগরের বেশ আয় হচ্ছিল, তিনি পরে তাও বিক্রী করে দিলেন পরের উপকারের জন্যে।

বিদ্যাসাগর যাঁদের যাঁদের উপকার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এমন জঘন্য ব্যবহার করেছেন, শুনলে লজ্জায় আর ঘৃণায় মর্মাহত হতে হয়।

বিদ্যাসাগর মশাই পরে একজনের সম্বন্ধে বলেছেন—"বিচিত্র সংসার, আমি যার প্রকৃত উপকার করেছি সে আমাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করল।"

বিদ্যাসাগরের এ ক্ষোভটা চিরকালই ছিল।

একদিন একজন লোক এসে বল্ল, "বিদ্যাসাগর, তোমাকে ঐ লোকটা গালাগালি দিচ্ছিল।"

বিদ্যাসাগর শুনে একটু চিন্তা করে বল্লেন, "কৈ, আমি তো তার কোনো উপকার করি নাই।"

তাঁর ধারণা হয়েছিল যার উপকার করা যায়, তারই তো গালাগালি করা সাজে।

—আঠারো—

বিদ্যাসাগর মশাই বই লিখেই চলেছেন। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তাঁর "সীতার বনবাস" প্রকাশ করেন। ভবভূতির লেখা "উত্তর চরিত" অবলম্বনে তিনি এই বই রচনা করেন।

বাংলা-সাহিত্যে "সীতার বনবাস" একখানি উপাদেয় বই। মাত্র চারদিনে এই বইখানা লেখা হয়। দিনের বেলা সময় পেতেন না বলে বিদ্যাসাগর মশাই রাত্রি ২॥০টা থেকে বই লিখতেন।

ছেলেবেলার মত বিদ্যাসাগর মশাই যৌবনেও অত্যন্ত বলশালী ছিলেন। কপাটি খেলতে বড়ই ভালোবাসতেন। যত বড় যোয়ানই হোক তাঁর সঙ্গে কেউ পেরে উঠত না।

বিদ্যাসাগর মশাই যখন বাড়ি যেতেন, অনেক টাকা আর অনেক কাপড়-চোপড় সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

এই সব টাকা আর কাপড়-চোপড় তিনি গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন,—তার কোনো বাছ্-বিচার ছিল না। পরের কোনো দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

বিদ্যাসাগর যেমন গরীবের বন্ধু ছিলেন তেমনি আবার ছিলেন সম্ভ্রান্ত আর ধনীলোকদের বন্ধু।

ধনী-গরীব সবাই তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত।

রাজা রামমোহনের ছোট ছেলে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল রমাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তিনি

প্রায়ই তাঁর বাড়িতে যেতেন। কিন্তু পরে তাঁদের মধ্যে কিছু মনো-মালিন্য হয়। আর মুখ দেখা-দেখিও বন্ধ হয়ে যায়।

তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বিদ্যাসাগর মশাই চোখের জল রাখতে পারেন নাই,—ছেলেমানুষের মত হাউ হাই ক'রে কেঁদেছিলেন।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মশাই ব্যারিষ্টারি পড়বার জন্যে বিলাত যান।

বিলাতে গিয়ে মাইকেল অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় পড়েন। এমনকি টাকার জন্যে তাঁকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়।

নিরুপায় হয়ে মাইকেল টাকার জন্যে বিদ্যাসাগরকে লেখেন।

বিদ্যাসাগরের হাতে তখন এক পয়সাও ছিল না,—কিন্তু বিদ্যাসাগর তো সাধারণ মানুষ নন,—তিনি যে অসাধারণের চেয়ে অসাধারণ।

ছয় হাজার টাকা ধার করে তিনি তৎক্ষণাৎ মাইকেলকে পাঠিয়ে দেন। এই টাকা না পেলে হয়তো মাইকেলকে বিদেশে না খেয়েই মরতে হোত।

পরে এ বিষয়ে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে লিখেছিলেন সমস্ত অন্তরের দরদ দিয়ে—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে—
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে, দীনের বন্ধু!" ইত্যাদি।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাইকেল দেশে ফিরে এলেন একেবারে নিঃস্ব হয়ে।

তিনি ফিরবার আগে বিদ্যাসাগরকে জানিয়েছিলেন তাঁর শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কথা।

বিদ্যাসাগর মশাই মাইকেলের জন্যে একটা তিনতলা বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছিলেন এবং দেশে ফেরার পর তাঁকে সেই বাড়িতে রাখলেন।

মাইকেল যাতে কলকাতায় ব্যারিষ্টারি করতে পারেন তার বন্দোবস্তও বিদ্যাসাগর মশাই করে দিলেন।

মাইকেল বিদ্যাসাগরকে বাবার মত ভক্তি করতেন, বিদ্যাসাগরও তাঁকে ছেলের মত স্নেহ করতেন। তাঁকে বিদ্যাসাগর মশাই কতভাবে যে সাহায্য করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

মাইকেলের শত দোষ বিদ্যাসাগর ক্ষমা করেছিলেন। মাইকেল ছিলেন অত্যন্ত বে-হিসাবী আর অমিতব্যয়ী,—কিন্তু বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর প্রতিভামুগ্ধ। তাই তাঁর অভাবে বিদ্যাসাগর বারে বারে সাহায্য করেছিলেন।

মাইকেল যে মাতৃভাষার মুখ এত উজ্জ্বল করেছেন—তাতেই বিদ্যাসাগর মশাই কৃতার্থ। মাইকেলের প্রশংসা তাঁর মুখে আর ধরত না। তাঁর সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করেছেন।

কেউ যদি বলত, "বিদ্যাসাগর, মাইকেল তোমার ঋণ শোধ করবে না?"

বিদ্যাসাগর হেসে উত্তর দিতেন, "মাইকেল কাব্যে-সাহিত্যে জন্মভূমির বহু ঋণ পরিশোধ করেছেন,—আমার ঋণ আর কতটা!"

বিদ্যাসাগরের এই রকম দানের আর অন্ত নাই। কত লোক কতভাবে যে বিদ্যাসাগরের কাছে ঋণী তার আর ইয়ত্তা নাই।

একবার দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগর মশাই বীরসিংহ গ্রামের আশে পাশের ১০।১২ খানা গ্রামের অন্নহীন লোকদের জন্যে অন্নছত্র খুলে দিয়েছিলেন।

যখন সেই ছত্রে নিরন্নেরা খেতে বসত, বিদ্যাসাগরের জয়ধ্বনিতে তারা আকাশ বাতাস ছেয়ে ফেলত।

বিদ্যাসাগরের কথা কি আর বলে শেষ করা যায়?

তিনি মানুষ না দেবতা?

সবাই বলত, "বিদ্যাসাগর হচ্ছেন সাক্ষাৎ দেবতা।"

—উনিশ—

কঠোর পরিশ্রমে বিদ্যাসাগরের শরীর ক্রমে ভেঙে আসছে—তবু কিন্তু কাজের বিরাম নাই।

১৮৬৯ সালে বর্ধমানে ভীষণ ম্যালেরিয়া মহামারীরূপে প্রকাশ পায়। অসংখ্য লোক এই ব্যাধিতে মারা যেতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর আর থাকতে পারলেন না, ছুটে গেলেন সেই ভয়াবহ বর্ধমানে। রোগীদের জন্যে ডিস্পেন্সারী স্থাপন করে,—চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে বিদ্যাসাগর ওষুধ-পথ্য আর পয়সা বিলি করতে লাগলেন রোগীদের মধ্যে।

কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর তখনকার ছোটলাট গ্রে সাহেবকে বলে এই মহামারী রোগের চিকিৎসার জন্যে জায়গায় জায়গায় 'ডিস্পেন্সারী' খোলালেন।

খবরের কাগজে কাগজে বিদ্যাসাগরের জয়গান হতে লাগলো।

বিদ্যাসাগরের অনুবাদ করবার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। তিনি

সেক্স্‌পিয়রের নাটক 'কমেডি অফ এরর'কে সুন্দর বাংলা অনুবাদ করলেন। এই বইটির নাম হোলো 'ভ্রান্তি-বিলাস'। পনেরো দিনে বিদ্যাসাগর এই বইটি লিখেছিলেন।

বাংলা স্কুল-পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এই 'ভ্রান্তি-বিলাস'ই বিদ্যাসাগরের শেষ বই। তিনি যতগুলি স্কুল পাঠ্য বই লিখেছিলেন তার সবগুলিই বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায় ছাপা হয়েছিল। অবশ্য দুই একখানা সুন্দর বই লেখা হলেও ছাপা হয় নাই। এই বইয়ের মধ্যে 'বাসুদেব-চরিত্র' আর 'রামের রাজ্যাভিষেক' বই দুখানা আর ছেপে বার হয় নাই।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। জিনিস পত্র কিছুই রক্ষা করা যায় নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বিদ্যাসাগর পুত্র নারায়ণ বাবুর সঙ্গে এক বিধবার বিয়ে হয়। পাত্রীর নাম ছিল শ্রীমতি ভব-সুন্দরী।

এই বিয়েতে বাড়ির আত্মীয়রা অমত করলেও বিদ্যাসাগরের সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল।

বিদ্যাসাগর চিরকাল যেটা ন্যায় বলে মনে করতেন তাই করতেন, সকলের শত বাধা দেওয়া সত্ত্বেও। এই জন্যে তাঁকে বহু নিন্দা সইতে হয়েছে। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্যও করেন নি। অটল বীরের মত এগিয়ে গেছেন তাঁর কর্তব্য পথে।

কিছুদিন পর বিদ্যাসাগরের জননী ভগবতী দেবী কাশীধামে কলেরা রোগে মারা যান।

—কুড়ি—

অদ্ভুতকর্মা বিদ্যাসাগরের নাম-যশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট-বড় সকলের মুখেই কীর্তিমান বিদ্যাসাগর সুখ্যাতি।

কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের অনেক বিষয় মতের মিল ছিল না, তবু তিনি কেশবচন্দ্রকে প্রীতির চোখে দেখতেন। কেশব বাবুও প্রায়ই বিদ্যাসাগরের বাড়িতে আসতেন।

রাজনারায়ণ বসুও অনেক বিষয়ে বিদ্যাসাগরের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। দুজনের মধ্যে অত্যন্ত প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বিদ্যাসাগরের মধ্যে যথেষ্ট বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁরা উভয়ে উভয়কে খুব ভালবাসতেন।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ দেবকে বিদ্যাসাগর মশাই অত্যন্ত ভক্তি করতেন, রামকৃষ্ণ দেবও বিদ্যাসাগরের গুণের কথা শুনে তাঁকে তাঁর বাড়িতে দেখতে এসেছিলেন।

পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে দেখেই পরিহাসচ্ছলে বলেছিলেন— "এইবার সাগরে এসে পড়েছি, কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।"

তার উত্তরে বিদ্যাসাগর হেসে বল্লেন, "এ সাগরে শুধু শামুক পাবেন, আর নোনা জল পাবেন বিস্তর।"

রামকৃষ্ণদেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন "অবিদ্যাসাগর তো নোনা, তুমিতো বিদ্যাসাগর, তুমি নোনা হতে যাবে কেন?"

বিদ্যাসাগরের কথা কি আর বলে শেষ করা যায়? কত বিচিত্র ঘটনা, কত অদ্ভুত ঘটনার সমাবেশ দেখা যায় এই একটি জীবনে।

বিদ্যাসাগর মশাই কার্মাটারের একটি নির্জন জায়গায় সুন্দর একটি বাংলো তৈরী করেছিলেন। এইখানে অনেক সাঁওতাল তাঁর প্রতিবেশী ছিল।

এই অশিক্ষিত সাঁওতালদের সঙ্গে পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর মশাই দরদী বন্ধুর মত সহজ ভাবে মিশতেন, তাদের কত ভালবাসতেন। তাদের অসুখ বিসুখে কত রকম সাহায্য করতেন বিদ্যাসাগর মশাই। সাঁওতালরাও বিদ্যাসাগরকে আপন জন বলে মনে করত,—পরম আত্মীয় বলে ভাবত।

এ বিষয়ে কত গল্প শোনা যায়—কত ঘটনার কথা জানা যায়।

কত বড় বড় লোক কার্মাটারে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে যেতেন, আর সাঁওতালদের মধ্যে বিদ্যাসাগর জনপ্রিয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মশাই ভীষণ পেটের অসুখে ভুগতে আরম্ভ করেন,—আগেই তাঁর এই রোগ হয়েছিল। এইবার তাঁর খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ হয়ে গেল। কোন কিছুই হজম করতে পারতেন না। কত চিকিৎসা হল, কত বড় বড় ডাক্তার এসে দেখলেন, কিন্তু কিছু হোলো না। তাঁরা সকলেই পরীক্ষা করে বলে গেলেন—"পেটে ক্যানসার হয়েছে।"

এই রোগেই বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর বাদুড়বাগানের বাড়িতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই অনন্তধামে প্রস্থান করলেন।

বিদ্যাসাগরের কথা এইখানেই শেষ করলাম বটে—কিন্তু এই ছোট বইতে তাঁর জীবনের অনেক কিছুই বলা গেল না।